ইউনিট-৮
নির্মিতি

পাঠ ৮.১ : বিপরীতার্থক শব্দ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বিপরীত শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- বিপরীত শব্দ কীভাবে গঠিত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মূল শব্দ ও তার বিপরীতার্থক শব্দ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাক্যে বিপরীতার্থক শব্দের যথার্থ ব্যবহার করতে পারবেন।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই এমন অনেক শব্দ আছে যা একটি শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। আমাদের বাংলা ভাষায়ও এরূপ অনেক শব্দ আছে যা প্রচলিত একটি শব্দের উল্টো বা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। প্রতিটি শব্দেরই একটি বিশেষ অর্থ থাকে, যদিও বাক্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে অর্থেরও ভিন্নতা থাকতে পারে। ভাষার ব্যবহারে এমন অনেক শব্দ আসে যার সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত একটি অর্থ রয়েছে। অর্থের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত বা ভিন্ন এই শব্দটিই ঐ মূল শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ। ভাষার সৌন্দর্যবিধান ও ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে অত্যাবশ্যকীয়ভাবেই এটি এসে পড়ে।

একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভাষার ব্যবহারে এর গুরুত্ব অপরিসীম। দক্ষতার সঙ্গে ভাষার ব্যবহার ও শিক্ষার্থীর শব্দসম্ভার বৃদ্ধির জন্য বিপরীতার্থক শব্দ জানা আবশ্যক। বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার করতে জানলে মনের ভাব অনেকক্ষেত্রে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করা সম্ভব।

বিপরীতার্থক শব্দ বিভিন্নভাবে গঠিত হতে পারে–

ক. উপসর্গযোগে : শব্দের পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হয়ে বিপরীতার্থক শব্দ গঠিত হতে পারে। সাধারণত অ, অন, অনা, অপ, অব, দুর, ন, না, নি, নির প্রভৃতি উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে প্রায়ই না-বাচক বা নিষেধবোধক অর্থ প্রকাশ করে।
যেমন : কাজ– অকাজ, ইচ্ছা– অনিচ্ছা, আগ্রহ– অনাগ্রহ, যশ– অপযশ, রোগ– নীরোগ, পথ– বিপথ প্রভৃতি।

খ. ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে : মূল শব্দের সঙ্গে মিল না রেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি শব্দ দ্বারা বিপরীতার্থক শব্দ গঠিত হতে পারে।
যেমন : অগ্র– পশ্চাৎ, আয়– ব্যয়, উষ্ণ– শীতল, জ্যোৎস্না– অন্ধকার, স্বর্গ– নরক, হাল্কা– ভারি প্রভৃতি।

গ. শব্দের পরে কিছু যুক্ত হয়ে : মূল শব্দের পরে কোনো শব্দ বা শব্দাংশ যুক্ত হয়ে বিপরীতার্থক শব্দ গঠিত হতে পারে। সাধারণত কোনো শব্দের শেষে হারা, হীন, বিহীন, শূন্য প্রভৃতি যুক্ত হয়ে মূল শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন : চরিত্রবান– চরিত্রহীন, প্রতিভাশালী– প্রতিভাহীন, সমৃদ্ধিশালী– সমৃদ্ধিহীন, রোগ– রোগহীন, বন্ধন– বন্ধনহারা প্রভৃতি।

নিচে বিপরীতার্থক শব্দের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেয়া হলো–

মূলশব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ	অনুকূল	প্রতিকূল
অম্ল	মধুর	অন্তর	বাহির

অধম	উত্তম	অলস	পরিশ্রমী
অজ্ঞান	সজ্ঞান	অমর	মর
অর্পণ	গ্রহণ	অনুরক্ত	বিরক্ত
আকাশ	পাতাল	আসল	নকল
আয়	ব্যয়	আলোক	অন্ধকার
আবির্ভাব	তিরোভাব	আবির্ভূত	তিরোহিত
আগে	পিছে	আকুঞ্চন	প্রসারণ
আবৃত	অনাবৃত	আমদানি	রপ্তানি
আবশ্যক	অনাবশ্যক	আস্তিক	নাস্তিক
আদি	অন্ত	আদিম	অন্তিম
আদান	প্রদান	আগমন	নির্গমন/প্রস্থান
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	আঁঠি	শাঁস
আস্থা	অনাস্থা	আহার	অনাহার
আরোহণ	অবরোহণ	আত্মীয়	অনাত্মীয়
আশা	নিরাশা	আহার	অনাহার
আবিল	অনাবিল	আদ্র	অনার্দ্র
আসামী	ফরিয়াদী	আকস্মিক	চিরন্তন

ইহকাল	পরকাল	ইষ্ট	অনিষ্ট
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	ইতর	ভদ্র
ইতি	আদি	ইহলোক	পরলোক
ইচ্ছুক	অনিচ্ছুক	ইতিবাচক	নেতিবাচক
ইদানীন্তন	তদানীন্তন	ইহলৌকিক	পারলৌকিক
ঈর্ষা	প্রীতি	ঈমান	বেঈমান
ঈষৎ	অধিক	ঈশান	নৈর্ঋত
ঈদৃশ	তাদৃশ		

উদয়	অস্ত	উচিত	অনুচিত
উত্থান	পতন	উর্বর	অনুর্বর
উন্নতি	অবনতি	উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উত্তপ্ত	শীতল	উষ্ণ	শীতল
উদ্ধত	বিনীত	উগ্র	সৌম্য/নম্র
উদার	সংকীর্ণ	উত্তর	দক্ষিণ
উদ্ভাসিত	ম্রিয়মান	উৎসাহ	নিরুৎসাহ
উজাড়	ভরপুর	উৎকৃষ্ট	নিকৃষ্ট
উজ্জ্বল	অনুজ্জ্বল	উজান	ভাটি
উর্বর	অনুর্বর	উলেøখ	অনুলেøখ
উপকারিতা	অপকারিতা	উপচিকীর্ষা	অপচিকীর্ষা
উন্মীলন	নির্মীলন	উন্মুখ	বিমুখ
উন্নতি	অবনতি	উদার	সংকীর্ণ
উপস্থিত	অনুপস্থিত	উতরানো	তলানো
উড়ন্ত	পড়ন্ত	উদ্বৃত্ত	ঘাটতি

উত্থিত	পতিত	উত্তরায়ন	দক্ষিণায়ন
উৎরাই	চড়াই	উদ্বিগ্ন	নিরুদ্বিগ্ন
ঊষর	উর্বর	ঊর্ধ্ব	অধঃ
ঊষা	সন্ধ্যা	ঊর্ধ্বগামী	নিম্নগামী
ঊর্ধ্বতন	অধস্তন	ঊর্ধ্বগতি	অধোগতি
ঊহ্য	স্পষ্ট	ঋজু	বক্র

একতা	বিচ্ছিন্নতা	এক	অনেক
এঁড়ে	বকনা	একাল	সেকাল
একূল	ওকূল	এদিক	ওদিক
ঐহিক	পারত্রিক	ঐক্য	বিভেদ/অনৈক
ঐচ্ছিক	আবশ্যিক	ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য
ঐতিহাসিক	অনৈতিহাসিক	ঐকমত্য	মতভেদ
ওস্তাদ	সাগরেদ	ঔদার্য	কার্পণ্য
ঔদ্ধত্য	বিনয়	ঔচিত্য	অনৌচিত্য
ঔজ্জ্বল্য	ম্লানিমা		

কঠিন	কোমল/তরল	কড়ি	কড়িশূন্য
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	কপট	অকপট/সরল
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ/কৃতঘ্ন	কুৎসা	প্রশংসা
কুৎসিত	সুন্দর	ক্রন্দন	হাস্য
কাপুরুষ	বীরপুরুষ	কোমল	কঠিন/কর্কশ
কৃষ্ণ	শুভ্র	কৃশ	স্থূল
কৃশকায়	স্থূলকায়	কুটিল	সরল
কল্পনা	বাস্তব	কল্যাণ	অকল্যাণ
কাজ	বিশ্রাম	কার্যকর	অকার্যকর
কুমেরু	সুমেরু	কুরুচি	সুরুচি
কুশিক্ষা	সুশিক্ষা	কেলেঙ্কারি	সুনাম
কু	সু	কৃত্রিম	স্বাভাবিক
ক্ষীণ	পুষ্ট	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
ক্ষিপ্ত	শান্ত	ক্ষয়	বৃদ্ধি
ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান	ক্ষুদ্র	বৃহৎ
ক্ষতি	লাভ		

খিড়কি	সিংহদার	গ্রাম্য	নাগরিক
গ্রহণ	বর্জন	প্রশংসা	নিন্দা
খুঁত	নিখুঁত	খণ্ড	অখণ্ড
খুব	অল্প	খাতক	মহাজন
খ্যাতি	অখ্যাতি	খ্যাত	অখ্যাত
খোঁজ	নিখোঁজ	খুশি	অখুশি
খাদ্য	অখাদ্য	খরিদ	বিক্রয়

গরল	অমৃত	গৌণ	মুখ্য
গ্রাম্য	শহুরে/বন্য	গৌরব	লাঘব
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	গ্রহণ	বর্জন
গুরু	লঘু	গুণ	দোষ
গুরু	শিষ্য	গোপনীয়	প্রকাশ্য
গাঢ়	পাতলা	গোপন	প্রকাশ
গৃহী	সন্ন্যাসী	গণ্য	নগণ্য
গ্রহীতা	দাতা	গুপ্ত	ব্যক্ত
গ্রাহ্য	অগ্রাহ্য	গতি	স্থিতি
গভীর	অগভীর		

ঘন	তরল	ঘুমন্ত	জাগ্রত
ঘাটতি	বাড়তি	ঘর	বার
ঘাত	প্রতিঘাত	ঘরোয়া	বাহির
ঘাট	অঘাট		

চড়াই	উৎরাই	চ্যুত	অচ্যুত
চঞ্চল	স্থির/অবিচল	চেতন	অবচেতন
চপল	গম্ভীর	চোর	সাধু
চতুর	বোকা	চোখা	ভোঁতা
চলতি	সাধু	চিরায়ত	সাময়িক
চাক্ষুষ	অগোচর	চিরন্তন	ক্ষণকালীন
চিন্তনীয়	অচিন্তনীয়	চালু	অচল
ছায়া	কায়া	ছাত্র	শিক্ষক
ছটফটে	শান্ত	ছোকড়া	বুড়ো

জয়	পরাজয়	জানা	অজানা
জন্ম	মৃত্যু	জনাকীর্ণ	জনবিরল
জীবন	মরণ	জাগরণ	নিদ্রা
জটিল	সরল	জ্যেষ্ঠা	কনিষ্ঠা
জাগ্রত	সুপ্ত/ঘুমন্ত	জ্বলন্ত	নিভন্ত
জলে	স্থলে	জিন্দা	মুর্দা
জ্ঞাতসারে	অজ্ঞাতসারে	জ্যোৎস্না	অমাবস্যা
জোয়ার	ভাটা	জৈব	অজৈব
জীবিত	মৃত	জাল	আসল
জাতীয়	বিজাতীয়	ঝুনা	কাঁচা
ঝানু	অদক্ষ	ঝগড়া	ভাব

টক	মিষ্টি	টাটকা	বাসি
ঠিক	বেঠিক	ঠাণ্ডা	গরম
ঠুনকো	মজবুত	ডুবন্ত	ভাসন্ত
ডাগর	ছোট	ডুবা	ভাসা

তাপ	শৈত্য	তেজ	নিস্তেজ
তরল	কঠিন	তরুণ	বৃদ্ধ
তীক্ষ্ণ	ভোতা	তখন	এখন
তিরস্কার	পুরস্কার	তিক্ত	মধুর
ত্যাজ্য	গ্রাহ্য	তীব্র	লঘু
ত্বরিত	শøথ	তদীয়	মদীয়
তুষ্ট	রুষ্ট	তন্ময়	মন্ময়
তৃপ্ত	অতৃপ্ত	তপ্ত	শীতল
তেজি	মন্দা	তস্কর	সাধু
তিমির	আলো	থামা	শুরু
থৈ	অথৈ		
দুর্বল	সবল	দাতা	গ্রহীতা
দিবা	নিশি	দুষ্কৃত	সুকৃত
দয়ালু	নিষ্ঠুর	দোষী	নির্দোষী
দরদি	বেদরদি	দৃঢ়	শিথিল
দ্যুলোক	ভূলোক	দ্বৈত	অদ্বৈত
দ্বিধা	নির্দ্বিধা	দখল	বেদখল
দুর্দিন	সুদিন	দুর্জন	সুজন
দুর্গম	সুগম	দুরন্ত	শান্ত
দেশি	বিদেশি	দৃশ্য	অদৃশ্য
দুঃশীল	সুশীল	দীর্ঘায়ু	স্বল্পায়ু
দিক	বিদিক	দাস	প্রভু
ধনবান	ধনহীন	ধরা	মরা
ধনিক	শ্রমিক	ধনী	গরিব
ধনাত্মক	ঋণাত্মক	ধবল	শ্যামল
ধৃত	মুক্ত	ধূর্ত	বোকা
ধীর	অধীর	ধারালো	ভোঁতা
ধর্ম	অধর্ম		

নিমগ্ন	উদাসীন	নেতিবাচক	ইতিবাচক
নন্দিত	নিন্দিত	নির্দয়	সদয়
নব	পুরাতন	নশ্বর	অবিনশ্বর
নির্মল	পঙ্কিল	নিষেধ	বিধি
নিদ্রিত	জাগ্রত	নীরস	সরস
নিরত	বিরত	নিশ্চয়তা	অনিশ্চয়তা
নির্লজ্জ	সলজ্জ	নির্দেশক	অনির্দেশক
নিরাশ্রয়	সাশ্রয়	নিরপেক্ষ	সাপেক্ষ
নিরাকার	সাকার	নিন্দা	প্রশংসা
নিচেষ্ট	সচেষ্ট	নিরাশা	আশা
নর	নারী	পাপ	পুণ্য

পণ্ডিত	মূর্খ	প্রবল	দুর্বল
প্রবীণ	নবীন	প্রশস্ত	সংকীর্ণ
প্রকৃতি	বিকৃতি	প্রভু	ভৃত্য
প্রস্থান	আগমন	প্রচ্ছন্ন	ব্যক্ত
প্রকাশ	গোপন	প্রসারণ	সংকোচন
পরকাল	ইহকাল	পুষ্ট	ক্ষীণ
প্রত্যর্থী	অর্থী	প্রাচীন	নব্য, নবীন
প্রসন্ন	বিষণ্ন	প্রীতিকর	অপ্রীতিকর
প্রারম্ভ	শেষ	প্রাচ্য	পাশ্চাত্য
প্রতিকূল	অনুকূল	প্রশ্বাস	নিঃশ্বাস
প্রশংসা	নিন্দা	প্রশান্ত	অশান্ত
প্রবাসী	স্বদেশি	প্রাচী	প্রতীচী
পুরস্কার	তিরস্কার	পুণ্যবান	পুণ্যহীন
পরিশোধিত	অপরিশোধিত	প্রকৃত	অপ্রকৃত
প্রশান্তি	অশান্তি	পূর্ববর্তী	পরবর্তী
প্রফুলø	ম্লান	প্রধান	অপ্রধান
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রতিযোগী	সহযোগী
প্রচুর	স্বল্প	প্রকৃষ্ট	নিকৃষ্ট
পদার্থ	অপদার্থ	পূর্বাহ্ণ	অপরাহ্ণ
পড়া	ওঠা	পরার্থ	স্বার্থ
পক্ষ	বিপক্ষ	পটু	অপটু
ফলবান	নিষ্ফলা	পক্ব	অপক্ব
ফল	অফল	ফলন্ত	নিষ্ফলা
ফাঁপা	নিরেট	ফর্সা	ময়লা

বাদী	বিবাদী	বাচাল	স্বল্পভাষী
বিধি	নিষেধ	বন্য	গৃহপালিত
বরখাস্ত	বহাল	বাদ	প্রতিবাদ
বধূ	বর	বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত
বিনীত	দুর্বিনীত, উদ্ধত	বিজয়	পরাজয়
বক্তা	শ্রোতা	বন্দনা	গঞ্জনা
বিরল	বহুল	বিয়োগান্ত	মিলনান্ত
বিজ্ঞ	অজ্ঞ	বিদ্বান	মূর্খ
ব্যর্থ	সার্থক	ব্যর্থতা	সার্থকতা
বিরহ	মিলন	বিষাদ	আনন্দ
ব্যক্ত	সুপ্ত	বিলম্বিত	দ্রুত
বিপন্ন	নিরাপদ	বিপথ	সুপথ
বিনয়	ঔদ্ধত্য	বিদ্যমান	অন্তর্হিত
বিজন	সজন	বাহুল্য	স্বল্পতা
বাস্তব	কল্পিত	বামপন্থী	ডানপন্থী
বন্ধন	মুক্তি	বাধ্য	অবাধ্য
বাদী	বিবাদী	বাড়তি	কমতি

বহু	কম	বহির্ভূত	অন্তর্ভুত
বন্ধুর	মসৃণ	বিরক্ত	অনুরক্ত
বিশ্রী	সুন্দর	বন্ধন	মুক্ত
ভীরু	নির্ভীক	ভণ্ড	সাধু
ভেজাল	খাঁটি	ভয়	সাহস
ভক্তি	অভক্তি	ভাঁটা	জোয়ার
ভাসা	ডোবা	ভোগ	ত্যাগ
ভেদ	অভেদ	ভূ-স্বামী	ভূমিহীন
ভূমিকা	উপসংহার	ভিন্ন	অভিন্ন
মধুর	তিক্ত	মিত্র	শত্রু
মুখ্য	গৌণ	মিলন	বিরহ
মুক্ত	বন্দি	মৃদু	তীব্র
মনীষা	নির্বোধ	মঙ্গল	অমঙ্গল
মনোযোগ	অমনোযোগ	মনোযোগী	অমনোযোগী
মর্যাদা	অমর্যাদা	মসৃণ	অমসৃণ
মৌখিক	লিখিত	মৌলিক	যৌগিক
মৃদু	প্রবল	মহৎ	নীচ
মিথ্যা	সত্য	মহাজন	খাতক
মহাত্ম্যা	নীচাত্মা	মান্য	অমান্য
মানা	অমানা	মিঠা	তিতা
মিল	অমিল	মূর্ত	বিমূর্ত
মোটা	সরু	মোক্ষ	বন্ধন
যশ	কলঙ্ক	যোগ্য	অযোগ্য
যান্ত্রিক	প্রাকৃতিক	যত্ন	অযত্ন
যৌথ	একক	যুদ্ধ	শান্তি
যুগল	একক	যাওয়া	আসা
যশ	অপযশ	যাজক	বিয়োজক
রব	নীরব	রাগ	বিরাগ
রিক্ত	পূর্ণ	রাজা	প্রজা
রুগ্ন	সুস্থ	রুদ্ধ	মুক্ত
রত	বিরত	রানী	রাজা
রোদ	বৃষ্টি	রুষ্ট	তুষ্ট
রাজি	নারাজ	রসিক	বেরসিক
রক্ষক	ভক্ষক		
লঘু	গুরু	লেন	দেন
লঘিষ্ঠ	গরিষ্ঠ	লাল	কালো
লম্ব	তির্যক	লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী
লাজুক	নির্লজ্জ	লব	হর
লিপ্সা	বিরাগ	লওয়া	দেওয়া

লৌকিক	অলৌকিক	লোভী	নির্লোভ
শিষ্ট	অশিষ্ট	শীতল	উষ্ণ
শত্রু	মিত্র	শৈত্য	উত্তাপ
শোক	হর্ষ/আনন্দ	শুভ	অশুভ
শূন্য	পূর্ণ	শীঘ্র	বিলম্ব
শ্রম	বিশ্রাম	শ্বাস	নিঃশ্বাস
শোভন	অশোভন	শুচি	অশুচি
শীত	গ্রীষ্ম	শান্তি	অশান্তি
শালীন	অশালীন	শারীরিক	মানসিক
শায়িত	উত্থিত	শঠ	সাধু
শর্বরী	দিবস	শ্রীযুক্ত	শ্রীহীন
শাসক	শাসিত	ষাঁড়	ষাঁড়
সিক্ত	শুষ্ক	স্থাবর	অস্থাবর
সকর্মক	অকর্মক	সংক্ষেপ	বিস্তর
সুষম	অসম	সাধু	তস্কর
সুখ্যাতি	কুখ্যাতি	স্মৃতি	বিস্মৃতি
সৃষ্টি	ধ্বংস	স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
স্থির	চঞ্চল	সম্বল	নিঃসম্বল
স্থলভাগ	জলভাগ	স্থাবর	অস্থাবর
স্তুতি	নিন্দা	সৌভাগ্যবান	ভাগ্যাহত
সুশ্রী	কুশ্রী	সুলভ	দুর্লভ
সুর	অসুর	সুপ্ত	জাগ্রত
সাকার	নিরাকার	সসীম	অসীম
সরস	নীরস	সরল	কুটিল
সরকারি	বেসরকারি	সুধা	গরল
সুদর্শন	কুদর্শন	সুন্দর	সুৎসিত
সাহসিকতা	ভীরুতা	সাহসী	ভীরু
সার্থক	নিরর্থক	সামনে	পিছনে
সার	অসার	সাবালিকা	নাবালিকা
সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য	সমাপ্ত	আরম্ভ
সমতল	অসমতল	সম্প্রসারণ	সংকোচন
সরু	মোটা	সদাচার	কদাচার
সদর	অন্দর	সদয়	নির্দয়
সত্য	মিথ্যা	সত্বর	ধীর
সংশেøষণ	বিশেøষণ	সংহত	বিভক্ত
সংশিøষ্ট	বিশিøষ্ট	সংযোগ	বিয়োগ
সঞ্চয়	অপচয়	সজ্ঞান	অজ্ঞান
সজীব	নির্জীব	সচ্ছল	অসচ্ছল
সচ্চরিত্র	দুশ্চরিত্র	সংক্ষিপ্ত	বিস্তৃত
সংকীর্ণ	প্রশস্ত	সংকুচিত	প্রসারিত

স্মরণ	বিস্মরণ	সুগম	দুর্গম
হ্রাস	বৃদ্ধি	হর্ষ	বিষাদ
হুঁশ	বেহুঁশ	ক্ষুদ্র	বৃহৎ
হক	বেহক	হলাহল	অমৃত, সুধা
হাজির	গরহাজির	হৃদ্যতা	শত্রুতা
হিসেবি	বেহিসেবি	হৃদ্য	ঘৃণ্য
হালকা	ভারি	হাল	সাবেক
হিত	অহিত		

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। বিপরীতার্থক শব্দ কী? বিপরীতার্থক শব্দ কীভাবে গঠিত হতে পারে? উদাহরণ দিন।

২। নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দলিখুন।

শব্দ	**বিপরীতার্থক শব্দ**	**শব্দ**	**বিপরীতার্থক শব্দ**
আলোক		সুলভ	
গ্রহণ		উন্নতি	
সরস		হর্ষ	
হ্রাস		লাভ	
সমাপ্ত		সুখ	
শীতল		আসল	
গোপনীয়		আয়	
ক্ষুদ্র		অন্তর	
গুরু		গ্রাম্য	

৩। নিচের শব্দগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখান।

উৎকর্স-অপকর্ষ, অন্তর-বাহির, চেনা-অচেনা, চোখা-ভোঁতা, যোগ-বিয়োগ, সবল-দুর্বল, নির্মল-পঙ্কিল, পাপ-পুণ্য।

পাঠ ৮.২ : এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য-সংকোচন বা বাক্য-সংক্ষেপণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- এক কথায় প্রকাশ কী তা বলতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত এক কথায় প্রকাশের উদাহরণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাক্যে এক কথায় প্রকাশের যথার্থ ব্যবহার করতে পারবেন।

একাধিক পদ একত্রে মিলিত হয়ে বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে আমরা বাক্য বলি। আবার কখনো কখনো এই একাধিক পদ বা উপবাক্যের সমষ্টি অর্থাৎ বাক্যের মনের ভাব বা অর্থকে অক্ষুণ্ন রেখে তাকে একটি শব্দেও প্রকাশ করা যায়। তাহলে পুরো একটি বাক্য না বলে তার বিকল্প ঐ শব্দটি বলাই ভালো। এতে সময়ও কম লাগে, আর বাক্যটিও শ্রুতিমধুর হয়। এভাবে পুরো একটি বাক্যের বা উপবাক্যের অর্থকে সংকোচন করে বা সংক্ষিপ্ত করে একটি শব্দে প্রকাশ করাই হলো এক কথায় প্রকাশ। যেহেতু এতে বাক্যের অর্থ সংকুচিত বা সংক্ষিপ্ত হয় সেজন্য একে আমরা বাক্য-সংকোচন বা বাক্য-সংক্ষেপণও বলতে পারি।

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশের নামই হলো এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংক্ষেপণ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভাষার ব্যবহারে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। দক্ষতার সঙ্গে ভাষার ব্যবহার ও শিক্ষার্থীর শব্দসম্ভার বৃদ্ধির জন্যও এক কথায় প্রকাশ জানা প্রয়োজন। বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশের নামই বাক্য সংক্ষেপণ বা এক কথায় প্রকাশ। ভাষাকে সহজ, সুন্দর ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করার জন্য বাংলা ভাষায় বাক্য সংক্ষেপণ অত্যন্ত প্রচলিত একটি নিয়ম। সাধারণভাবে বাক্য সংক্ষেপণ সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের সাহায্যে হয়ে থাকে। আবার এগুলো ব্যতীত সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ দিয়েও এক কথায় প্রকাশ করা যেতে পারে।

নিচে এক কথায় প্রকাশের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেয়া হলো–

অ

অগ্রে বর্তমান থাকে যে – অগ্রবর্তী
অক্ষির সম্মুখে – প্রত্যক্ষ
অহংকার করে যে – অহংকারী
অভিজ্ঞতার অভাব – অনভিজ্ঞ
অনেকের মধ্যে একজন – অন্যতম
অগ্রে জন্মিয়াছে যে – অগ্রজ
অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে – অনুজ
অতি দীর্ঘ নয় যা – নাতিদীর্ঘ
অক্ষির অগোচর – পরোক্ষ
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা – অনুসন্ধিৎসা
অন্যদিকে মন যার – অন্যমনস্ক/অন্যমনা
অপকার করার ইচ্ছা – অপচিকীর্ষা
অন্য দেশ – দেশান্তর
অন্য বার – বারান্তর
অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে যে কাজ করে – অবিমৃষ্যকারী
অতি শীতও নয় অতি উষ্ণও নয় – নাতিশীতোষ্ণ
অবশ্যই যা হবে – অবশ্যম্ভাবী
অশ্বের ডাক – হ্রেষা
অল্প কথা বলে যে –অল্পভাষী
অধ্যাপনা করেন যিনি – অধ্যাপক
অন্য উপায় নেই – অগত্যা
অন্তর্গত অপ যার – অন্তরীপ
অরিকে দমন করেন যিনি – অরিন্দম
অণুকে দেখা যায় যার দ্বারা – অণুবীক্ষণ
অগ্র-পশ্চাৎ ক্রম অনুযায়ী – আনুপূর্বিক

অবজ্ঞায় নাক উঁচু করে যে – উন্নাসিক
অতিকষ্টে যা নিবারণ করা যায় – দুর্নিবার
অর্থহীন উক্তি – প্রলাপ
অপূর্ব সৃষ্টিশীল ক্ষমতা – প্রতিভা
অল্প পরিশ্রমে শ্রান্ত নারী – ফুলটুসি
অলংকারের ধ্বনি – শিঞ্জন
অবলীলার সঙ্গে – সাবলীল
অসূয়া নেই যার (স্ত্রী) – অনসূয়া
অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করেন যিনি – অন্তর্যামী
অন্ধকার রাত্রি – তামসী
অতি উচ্চ ধ্বনি – মহানাদ
অতি উচ্চ রোল – উতরোল
অনুচিত বল প্রয়োগকারী – হঠকারী
অহনের পূর্বাংশ – পূর্বাহ্ন
অহনের অপর অংশ – অপরাহ্ন
অহনের মধ্য অংশ – মধ্যাহ্ন
অন্য গতি – গত্যন্তর
অশ্ব রাখার স্থান – আস্তাবল

আ

আকাশে চরে যে – খেচর
আচরণের যোগ্য – আচরণীয়
আপনাকে কেন্দ্র করেই যার চিন্তা – আত্মকেন্দ্রিক
আলøাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে যে – আস্তিক
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত
আকাশে গমন করে যে – বিহঙ্গ
আদরের সাথে – সাদরে
আটপ্রহর যা পরা যায় – আটপৌরে
আপনার রং লুকায় যে – বর্ণচোরা
আমিষের অভাব – নিরামিষ
আয় আনুসারে যিনি ব্যয় করেন – মিতব্যয়ী
আত্মাকে অধিকার করে – অধ্যাত্ম
আপনাকে ভুলে থাকে যে –আত্মভোলা
আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে – পণ্ডিতমন্য
আলøাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার – নাস্তিক
আজীবন অবিবাহিত আছে যে – চিরকুমার
আঘাতের বিপরীত – প্রত্যাঘাত, প্রতিঘাত
আদি নেই যার – অনাদি
আবক্ষ জলে নেমে স্নান – অবগাহন
আয়নায় দেখা মূর্তি – প্রতিবিম্ব
আরাধনার যোগ্য যিনি – আরাধ্য
আদরিণী কন্যা – দুলালি।

ই

ইতিহাস লেখেন যিনি – ঐতিহাসিক
ইহলোক বিষয়ক – ঐহিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – ইতিহাসবেত্তা
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে – জিতেন্দ্রিয়
ইষ্টক নির্মিত গৃহ – অট্টালিকা
ইহার তুল্য – ঈদৃশ
ইতঃপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি – দাগি

ঈ

ঈষৎ রক্তবর্ণ – আরক্ত
ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন যিনি – আস্তিক
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার – আঁষটে
ঈশ্বর বিষয়ক – ঐশ্বরিক
ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ – ধূসর
ঈষৎ নীলবর্ণ – নীলাভ
ঈষৎ হাস্য – স্মিত

উ

উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে – কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে – অকৃতজ্ঞ
উপকারীর অপকার করে যে – কৃতঘ্ন
উপকার করার ইচ্ছা – উপচিকীর্ষা
উলেøখ করা হয় না যা – উহ্য
উপন্যাস রচয়িতা – ঔপন্যাসিক
উপায় নেই যার – নিরুপায়
উদ্ভিদের নতুন পাতা – পলøব/কিশলয়।

ঊ

ঊর্ধ্বদিকে গমন করে যে –ঊর্ধ্বগামী

উর্ধ্ব থেকে নেমে আসা – অবতরণ
উর্ধ্বদিকে গতি যার – ঊর্ধ্বগতি

ঋ

ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি – ঋত্বিক।
ঋষির ন্যায় – ঋষিকল্প।
ঋণশোধে অসমর্থ – দেউলিয়া

এ

একই গুরুর শিষ্য – সতীর্থ
একই মাতার উদরে জাত যারা – সহোদর
এ পর্যন্ত যার শত্রু জন্মায়নি – অজাতশত্রু
এক থেকে আরম্ভ করে – একাদিক্রমে
এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় যে – যাযাবর
একই সময়ে – যুগপৎ
একবার শুনলে যার মনে থাকে – শ্রুতিধর
একই কালে বর্তমান – সমকালীন
একই সময়ে বর্তমান – সমসাময়িক
একসঙ্গে যারা যাত্রা করে –সহযাত্রী
এঁটেল ও বেলেমাটির মিশ্রণ – দোআঁশ

ঐ

ঐক্যের অভাব আছে যাতে –অনৈক্য
ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি –ঐশ্বর্যবান

ও

ওষ্ঠ ও অধর – ওষ্ঠাধর
ওষ্ঠের দ্বারা উচ্চারিত – ঔষ্ঠ্য
ওজন করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে – তুলাদণ্ড

ঔ

ঔষধি থেকে উৎপন্ন – ঔষধ।
ঔষধের বিপণি – ঔষধালয়
ঔষধের আনুষঙ্গিক সেব্য – পথ্য

ক

কবিতা লেখেন যিনি – কবি
কোথাও নত কোথাও উন্নত – বন্ধুর
কাচের তৈরি ঘর – শিশমহল
ক্রিয়ার বিপরীত – প্রতিক্রিয়া
কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী – কর্মঠ
কর্মে অতিশয় কুশল – কর্মঠ
কোকিলের ডাক – কুহু
কণ্ঠ পর্যন্ত – আকণ্ঠ
কর্ণ পর্যন্ত – আকর্ণ
কী করতে হবে যে স্থির করতে পারে না – কীংকর্তব্যবিমূঢ়
কুৎসিত আকার যার – কদাকার
কৃষি থেকে উৎপন্ন –কৃষিজ
ক্ষমা করার ইচ্ছা – তিতিক্ষা
কূলের বিপরীত –প্রতিকূল
কিছু বলতে যার ঠোঁটে বাধে না – ঠোঁটকাটা

খ

খাইবার ইচ্ছা – ক্ষুধা
খুব দীর্ঘ নয় –নাতিদীর্ঘ/অনতিদীর্ঘ
খরচের হিসাব যার নেই – বেহিসেবি
খাতাপত্র রাখার ঘর – দপ্তরখানা

গ

গণনার অযোগ্য – নগণ্য
গাছে উঠতে পটু যে – গেছো
গৃহে থাকে যে –গৃহস্থ
গমনের ইচ্ছা – জিগমিষা
গোপন করার ইচ্ছা – জুগুপ্সা
গভীর রাত্রি – নিশীথ
গমন করতে পারে যে – জঙ্গম
গাড়ি চালায় যে – গাড়োয়ান
গ্রন্থ রাখার গৃহ – গ্রন্থাগার।
ঘোড়া থাকার স্থান – ঘোড়াশাল/আস্তাবল
ঘোর অন্ধকার রাত্রি – তামসী/তমিস্রা
ঘটনার বিবরণ – প্রতিবেদন

চ

চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা যা জানতে পারা যায় না– অতীন্দ্রিয়
চিরস্থায়ী নয় যা – অনিত্য/নশ্বর
চৈত্র মাসের ফসল – চৈতালি
চিবিয়ে খেতে হয় যা – চর্ব্য
চার রাস্তার মিলনস্থল – চৌরাস্তা
চোখে দেখা যায় যা –চাক্ষুষ
চুষে খেতে হয় যা – চূষ্য
চক্ষুলজ্জাহীন ব্যক্তি – চশমখোর
চোখে দেখা যায় যা – প্রত্যক্ষ
চোখের দ্বারা দৃষ্ট – চাক্ষুষ
চিরকাল মনে রাখার যোগ্য – চিরস্মরণীয়

ছ

ছন্দে নিপুণ যিনি – ছান্দসিক
ছয় মাস অন্তর – ষান্মাসিক
ছল করে কান্না – মায়াকান্না

জ

জানিবার ইচ্ছা – জিজ্ঞাসা
জয় করিবার ইচ্ছা– জিগীষা
জানু পর্যন্ত – আজানু
জলে স্থলে যে জন্তু বিচরণ করে – উভচর
জীবিত থেকেও যে মৃত – জীবন্মৃত
জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে যা – জাজ্বল্যমান
জয়সূচক যে উৎসব – জয়ন্তী
জল দেখে ভয় পাওয়া – জলাতঙ্ক
জলে চরে যে – জলচর
জলে জন্মে যা – জলজ
ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা – ঝাপট
ঝন ঝন শব্দ – ঝঙ্কার/ঝনৎকার

ট

টাইমের বাইরে – বেটাইম
টোল পড়েনি এমন – নিটোল।

ঠ

ঠিক নয় – বেঠিক
ঠাকুরের ভাব – ঠাকুরালি
ঠান্ডায় পীড়িত – শীতার্ত।

ড

ডুব দিতে জানে যে – ডুবুরি
ডাক বহন করে যে – ডাকহরকরা
ডিঙি বইবার দাঁড় – বৈঠা

ঢ

ঢিপির মতো – ঢ্যাপসা
ঢাক বাজায় যে – ঢাকি

ত

তাল জ্ঞান নেই যার – তালকানা
তির নিক্ষেপ করে যে – তিরন্দাজ
তালু থেকে উচ্চারিত – তালব্য
তার মতো – তাদৃশ
তবলায় নিপুণ – তবলচি
ত্রিকাল দর্শন করেন যিনি – ত্রিকালদর্শী
ত্রাণ করেন যিনি – ত্রাতা
তুলা থেকে তৈরি – তুলট
তল স্পর্শ করা যায় না যার – অতলস্পর্শ

দ

দিবসের শেষ ভাগ – অপরাহ্ণ
দ্বীপের সদৃশ – উপদ্বীপ
দেহে, মনে ও কথায় – কায়মনোবাক্যে
দু'দিকে অপ যার – দ্বীপ
দু'বার জন্ম হয় যার – দ্বিজ
দু'রথীর যুদ্ধ – দ্বৈরথ
দোহনের যোগ্য – দোহনীয়
দু'বার বলা – দ্বিরুক্তি
দু'হাতে সমান কাজ করতে পারে যে – সব্যসাচী
দাড়ি জন্মে নি যার – অজাতশ্মশ্রু
দেখা যায় না যা – অদৃশ্য

ধ

ধ্যান করেন যিনি – ধ্যানী
ধূলায় পরিণত – ধূলিসাৎ
ধীরে যে গমন করে – ধীরগামী/মন্দগামী
ধনের দেবতা – কুবের

ন

নৌকা চালনা করে যে – নাবিক
নূপুরের ধ্বনি – নিক্কণ
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময় – নিদাঘ
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার – নশ্বর
নিকৃষ্ট ব্যক্তি – দুর্জন
নাটকের পাত্রপাত্রী – কুশীলব
নৌ চলাচলের যোগ্য – নাব্য
নিষ্কাশিত সারবস্তু – নির্যাস

প

পা থেকে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক
পান করার ইচ্ছা – পিপাসা
পরে জন্মেছে যে – অনুজ
পূর্বে ছিল এখন নেই – ভূতপূর্ব
পিতার ভ্রাতা – পিতৃব্য
পাখির কলরব – কুজন
পূর্বে যা শোনা যায়নি – অশ্রুতপূর্ব
পুর্বে যা দেখা যায়নি – অদৃষ্টপূর্ব
পান করার যোগ্য নয় – অপেয়
পশ্চাতে গমন করে যে – অনুগামী
পেতে ইচ্ছা –ঈপ্সা
পরস্পরে আলিঙ্গন – কোলাকুলি
পশুহত্যা করে যে – কসাই
পরের ভালো যে দেখতে পারে না – পরশ্রীকাতর
পুরাকালের বিষয় যিনি জানেন – পুরাতাত্ত্বিক
পান করার যোগ্য – পেয়।
পঙ্কে জন্মে যা – পঙ্কজ
পড়া হয়েছে যা – পঠিত
পরিমিত ব্যয় করে যে – মিতব্যয়ী
পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যা – দেদীপ্যমান
পরিমিত আহার করে যে – মিতাহারী

ফ

ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় – ওষধি
ফুল হতে জাত – ফুলেল
ফুটছে এমন – ফুটন্ত

ব

বাঘের চামড়া – কৃত্তি
বসন আগলা যার – অসংবৃত
বিসংবাদ নেই যাতে – অবিসংবাদিত
বিদেশে থাকে যে – প্রবাসী
বিশ্বজনের হিতকর – বিশ্বজনীন
বহুর মধ্যে একটি – অন্যতম
বর্ণনা করা যায় না যা – অবর্ণনীয়
বুকে হেঁটে গমন করে যে – উরগ
বলা হয়েছে যা – উক্ত
বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে যে – উদ্বাস্তু
বপন করা হয়েছে যা – উপ্ত
বীণার ধ্বনি – ঝঙ্কার
বচনে কুশল – বাগ্মী
বেদ সম্বন্ধীয় – বৈদিক
বৃদ্ধি পাওয়া যার স্বভাব – বর্ধিষ্ণু
বেশি কথা বলে যে – বাচাল
বিধিকে অতিক্রম না করে – যথাবিধি

ভ

ভিতর থেকে গোপনে ক্ষতিসাধন – অন্তর্ঘাত
ভ্রমরের শব্দ – গুঞ্জন
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে যে – দূরদর্শী
ভোজন করতে যে চায় – বুভুক্ষু
ভস্মে পরিণত হয়েছে যা – ভস্মীভূত
ভ্রমণ করা স্বভাব যার – ভ্রমর

ম

মমতা নেই যার – নির্মম
মরণ পর্যন্ত – আমরণ

মৃতের মতো অবস্থা যার – মুমূর্ষু
ময়ূরের ডাক – কেকা
মর্মকে ভেদ করে যা – মর্মভেদী
মরে না যে – অমর
মনোগত ইচ্ছা – ঈপ্সিত
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক – মুমুক্ষু
মধু পান করে যে – মধুপ
মর্ম স্পর্শ করে যা – মর্মস্পর্শী
মন হরণ করে যা – মনোহর
মৃৎ অঙ্গ যার – মৃদঙ্গ

য

যা হতে পারে না – অসম্ভব
যা বিশ্বাস করা যায় না – অবিশ্বাস্য
যা মৃতের মতো – মৃতবৎ
যা সহজে লাভ করা যায় – সুলভ
যা যুক্তিসঙ্গত নয় – অযৌক্তিক
যা দেখা যায় না – অদৃশ্য
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে – বর্ধিষ্ণু
যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি – অদৃষ্টপূর্ব
যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়
যা জলে ও স্থলে চরে – উভচর
যা লেহন করে খেতে হয় – লেহ্য
যা বর্ণনা করা যায় না – অবর্ণনীয়
যা সারাদিন ব্যবহার করা হয় – আটপৌরে
যা পূর্বে ছিল এখন নাই – ভূতপূর্ব
যা পরিমাপ করা যায় না – অপরিমেয়
যা বলার যোগ্য নয় – অকথ্য
যা অতি দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ
যা উড়ছে – উড্ডীয়মান
যার বংশ পরিচয় ও স্বভাব কেউ জানে না– অজ্ঞাতকুলশীল
যা সহজে ভেঙে যায় – ভঙ্গুর
যা প্রবীণ বা প্রাচীন নয় – অর্বাচীন
যা চিবিয়ে খাওয়া যায় – চর্ব্য
যা জলে জন্মে – জলজ
যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়
যা কষ্টে নিবারণ করা যায় – দুর্নিবার
যার কোনো ভয় নেই – অকুতোভয়
যার শেষ নেই – অশেষ
যা উড়িতেছে – উড্ডীয়মান
যা নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে – পরিবর্তনশীল
যা পূর্বে দেখা যায় নি – অদৃষ্টপূর্ব
যা কষ্টে লাভ করা যায় – দুর্লভ
যা বপন করা হয়েছে – উপ্ত
যা মাটি ভেদ করে ওঠে – উদ্ভিদ
যা পানের যোগ্য – পেয়
যা উদিত হয়েছে – উদীয়মান
যা দমন করা যায় না – অদম্য
যাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় – হৃদয়বিদারক
যার কোথাও কোনো ভয় নাই – অকুতোভয়
যার স্ত্রী বিগত হয়েছে – বিপত্নীক
যার হৃদয় শোভন – সুহৃদ
যারা এক মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছে – সহোদর
যার গন্ধ ভালো – সুগন্ধ
যার আকার কুৎসিত – কদাকার
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে – প্রত্যুৎপন্নমতি
যার অন্য উপায় নেই – অনন্যোপায়
যিনি অধিক ব্যয় করেন না – মিতব্যয়ী
যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাগ্মী
যিনি বিদ্যালাভ করেছেন – কৃতবিদ্য
যিনি কষ্ট সহ্য করতে পারেন – কষ্টসহিষ্ণু
যে স্ত্রীর বশীভূত – স্ত্রৈণ
যে নারীর সন্তান হয় না – বন্ধ্যা
যে রমণী প্রিয় কথা বলে – প্রিয়ংবদা
যে উপকারীর অপকার করে – কৃতঘ্ন
যে গমন করে না – নগ
যে হিত ইচ্ছা করে – হিতৈষী
যে জামাই শ্বশুর বাড়িতে থাকে – ঘরজামাই
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না – আগাছা
যে পুরুষ বিয়ে করেনি – অকৃতদার
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে – অবিমৃষ্যকারী
যে রমণীর বিয়ে হয় নি – কুমারী/অনূঢ়া
যে জমিতে দুবার ফসল হয় – দোফসলী

র

রব শুনে এসেছে যে – রবাহুত
রেশমের দ্বারা তৈরি – রেশমি
রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ায় যে – হাতুড়ে

ল

লজ্জা বেশি যার – লাজুক
লজ্জা নেই যার – নির্লজ্জ, বেহায়া
লাভ করিবার ইচ্ছা – লিপ্সা
লোক গণনা – আদমশুমারি
লয় প্রাপ্ত হয়েছে যা – লীন

শ

শ্রবণের যোগ্য – শ্রব্য
শ্রদ্ধার যোগ্য – শ্রদ্ধেয়
শৈশবকাল থেকে – আশৈশব
শত পাপড়িবিশিষ্ট – শতদল
শত অব্দের সমাহার – শতাব্দী

ষ

ষোল বছর বয়স্কা – ষোড়শী
সহজে ভয় পায় যে – ভীরু/ভীতু
সমস্ত জীবন ব্যাপী – যাবজ্জীবন

স

সবচেয়ে বড় – জ্যেষ্ঠ্য
সবচেয়ে ছোট – কনিষ্ঠ
সকলের জন্য প্রযোজ্য – সার্বজনীন
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ – সর্বশ্রেষ্ঠ
সেবা করেন যিনি – সেবক/সেবিকা
সর্বজনের হিতকর – সর্বজনীন
স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান – সস্ত্রীক।

হ

হস্তীর ডাক – বৃংহতি
হরিণের চামড়া – অজিন
হিসাব করে চলে না যে - বেহিসাবি
হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত – আসমুদ্রহিমাচল
হনন করার ইচ্ছা – জিঘাংসা
হেমন্তে জাত – হৈমন্তিক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। এক কথায় প্রকাশ বলতে কী বোঝায়?
২। বাংলা ভাষায় এক কথায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
৩। এক কথায় প্রকাশ করুন

আদরের সাথে
যা উড়ছে
যা চিবিয়ে খাওয়া যায়
লাভ করার ইচ্ছা
যা চিবিয়ে খাওয়া যায়
যা পানের যোগ্য
যাহা দমন করা যায় না
যা কষ্টে জয় করা যায়
যা জলে জন্মে
বাঘের চামড়া
গণনার অযোগ্য

৪। সত্য হলে স এবং মিথ্যা হলে মি লিখুন

ক. যা অতি দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ

খ. যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাক্যটি সংক্ষেপ করা যায় না

গ. যা যুক্তিসঙ্গত নয় – সংক্ষিপ্ত রূপ হবে অযৌক্তিক

ঘ. খাইবার ইচ্ছা – সংক্ষিপ্ত রূপ রান্নাঘর

ঙ. উড্ডীয়মান শব্দটির বিস্তারিত রূপ 'যা উড়ছে'।

পাঠ ৮.৩ : বাগধারা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাগধারা কী তা বলতে পারবেন।
- শব্দ বা শব্দসমষ্টির আক্ষরিক অর্থ ও বিশেষ অর্থের পার্থক্য করতে পারবেন।
- বাক্যে বাগধারার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবেন।
- বাগধারার অর্থ জেনে তার যথার্থ ব্যবহার করতে পারবেন।

আমাদের বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ বা শব্দসমষ্টি আছে যার আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থ একরকম কিন্তু বাক্যে ব্যবহারের পর তার ভিন্ন বা বিশেষ একটি অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন : 'অর্ধচন্দ্র' দিয়ে আমরা এর আক্ষরিক অর্থ 'অর্ধেক চাঁদ'-কে বুঝি। কিন্তু যখন এটি বাক্যে এভাবে ব্যবহৃত হয় যে 'করিম চোরটিকে **অর্ধচন্দ্র** দিয়ে বিদায় করে দিল' তখন এটি একটি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, যার অর্থ 'গলা ধাক্কা' দেয়া। এই 'অর্ধচন্দ্র' শব্দটি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে আক্ষরিক অর্থ প্রকাশ না করে একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করার রীতি হলো বাক্যরীতি বা বাগধারা। তাহলে আমরা বলতে পারি–

কোনো শব্দ বা শব্দসমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে যখন তার একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বাগধারা বলে।

বাগধারা বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এটি ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা খুব সহজে ও আকর্ষণীয় করে মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়। বাগধারা হিসেবে ব্যবহৃত শব্দাবলি সাধারণ অর্থকে অতিক্রম করে যায় বলে ভাষা প্রাণবন্ত ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। বাক্য-ব্যবহারে একটি চমক ও রসময়তার সৃষ্টি হয়। এতে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ও শ্রুতিমধুরতা আনে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভাষার ব্যবহারে এর একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাগধারার বিশেষ অর্থটি জানা ও তার যথার্থ ব্যবহার করতে জানলে মনের ভাব প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করা সহজ হয়।

আসুন, আমরা এই পাঠে বাগধারার বিশেষ অর্থ ও বাক্যে তার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হই–

অ

১. অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ) – অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটা প্রতিবছর ফেল করে, তাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।
২. অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) – লোকটা দুদিনের জ্বরেই অক্কা পেয়েছে।
৩. অগস্ত্য যাত্রা (চিরদিনের জন্য প্রস্থান) – গরিবের টাকা চুরি করে লোকটা গ্রাম থেকে অগস্ত্য যাত্রা করেছে।
৪. অন্ধের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন) – বুড়ি মায়ের একমাত্র ছেলেটিই অন্ধের যষ্টি।
৫. অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) – ঐ কৃপণ বুড়োর কাছে টাকা চাওয়া আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা।
৬. অগাধ জলের মাছ (চতুর ব্যক্তি) – সে তো অগাধ জলের মাছ, তার মনের ফন্দি-ফিকির বুঝবে কী করে?
৭. অন্ধকারে ঢিল মারা (না জেনে কিছু করা) – বিষয়টা আগে ভালো করে জেনে নাও, অন্ধকারে ঢিল মারা ঠিক নয়।
৮. অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী (অল্পবিদ্যার গর্ব) – অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী বলেই ফটিক মিয়া সবার সমালোচনা করে।
৯. অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা) – বেয়াদব লোকটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে মজলিশ থেকে বিদায় করে দাও।
১০. অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শনীয়) – তুমি যে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলে, তোমার আর দেখাই পাওয়া যায় না।

১১. অগ্নিপরীক্ষা (কঠিন পরীক্ষা) – জাতীয় জীবনে এ এক অগ্নি পরীক্ষা– এতে আমাদের উত্তীর্ণ হতেই হবে।
১২. অহিনকুল সম্পর্ক (ভীষণ শত্রুতা) – ভাইয়ে ভাইয়ে এখন অহিনকুল সম্পর্ক– কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখে না।
১৩. অথৈ জলে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – চাকুরিটা হারিয়ে সে এখন অথৈ জলে পড়েছে।
১৪. অগ্নি শর্মা (অতিশয় ক্রুদ্ধ) – কথাটি শোনামাত্র তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।
১৫. অকূল পাথার (সীমাহীন বিপদ) – ভিটে মাটি সর্বস্ব হারিয়ে এখন আমি অকূল পাথারে ভাসছি।
১৬. অনুরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধে কঠিন কাজ করার সম্মতি জ্ঞাপন) – এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয় তবু বন্ধুদের অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে।
১৭. আদায় কাঁচকলায় (পরম শত্রুতা) – শ্বাশুড়ি-বৌতে একেবারে আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক।
১৮. আসরে নামা (অবতীর্ণ হওয়া) – আশরাফ সাহেব এবার সুযোগ বুঝে রাজনীতির আসরে নেমে পড়েছেন।

আ

১৯. আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) – ঘরে বসে আকাশ কুসুম কল্পনা করলে কিছু হবে না– চাই পরিশ্রম আর নিষ্ঠা।
২০. আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড) – বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে ৫০ টাকা আক্কেল সেলামি দিয়ে ফিরে এলাম।
২১. আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক হওয়া) – কাঁচামালের ব্যবসা করে এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।
২২. আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি) – তার মিথ্যা অভিযোগ শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।
২৩. আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) – সে একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি– তাকে কোনো দায়িত্ব দিয়ে লাভ নেই।
২৪. আকাশ ভেঙে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – চাকুরি হারিয়ে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।
২৫. আষাঢ়ে গল্প (আজগুবি গল্প) – তুমি খালি হাতে বাঘ মেরেছ –এটা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কিছুই নয়।
২৬. আমড়াগাছি করা (তোষামোদ করা) – বড় সাহেবকে আমড়াগাছি করে সে এবার বড় একটা ঠিকাদারি পেয়ে গেছে।
২৭. আকাশ থেকে পড়া (না জানার ভান করা) – তার জেল হয়েছে শুনে তুমি আকাশ থেকে পড়লে মনে হচ্ছে।
২৮. আকাশ পাতাল (দুস্তর ব্যবধান) – আকাশ-পাতাল ভেবে কোনো লাভ নেই, যে সুযোগটা আছে সেটাই গ্রহণ কর।
২৯. আলালের ঘরের দুলাল (আদুরে ছেলে) – ওতো আলালের ঘরের দুলাল, সে এত পরিশ্রমের কাজ পারবে কেন?
৩০. আঁতে ঘা দেওয়া (মনে কষ্ট দেওয়া) – তুমি এমন আঁতে ঘা দেওয়া রূঢ় কথা বলছ কেন?
৩১. আদা জল খেয়ে লাগা (সর্বাত্মক চেষ্টা করা) – পরীক্ষা পাশের জন্য তুমি এবার আদাজল খেয়ে লেগেছ মনে হচ্ছে।
৩২. আঠার মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রিতা) – তোমার তো আঠার মাসে বছর, এই সামান্য কাজ করতেই এতদিন লেগে গেল।
৩৩. আদিখ্যেতা (ন্যাকামি স্বভাব) – বাবা মায়ের শাসন না থাকায় মেয়ের আদিখ্যেতা বেড়ে গেছে।
৩৪. আপন পায়ে কুড়াল মারা (নিজের ক্ষতি করা) – লেখাপড়া না শিখে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছ।

ই

৩৫. ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব) – ও ইঁচড়ে পাকা ছেলে– না হলে বাবা-মায়ের সঙ্গে এরকম তর্ক করে।
৩৬. ইতর বিশেষ (পার্থক্য) – ছেলে-মেয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ না করে দুজনেরই লেখাপড়ার সমান সুযোগ দাও।
৩৭. ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) – আমি হলাম ইঁদুর কপালে - আমার ভাগ্যে কি আর লটারির টাকা জুটবে!
৩৮. ঈদের চাঁদ (আকাঙ্ক্ষিত বস্তু) – অনেক দিন পর ছেলে বাড়ি আসায় মা যেন হাতে ঈদের চাঁদ পেয়েছেন।

উ

৩৯. উত্তম মধ্যম (প্রহার) – পুলিশে দিয়ে কী হবে, চোরটিকে উত্তম মধ্যম দিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দাও।

৪০. উলুবনে মুক্তা ছড়ান (অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান) –চোরকে উপদেশ দেওয়া আর উলুবনে মুক্তা ছড়ান একই কথা।

৪১. উনপাঁজুরে (দুর্বল) – এই উনপাঁজুরে ছেলেটি দুপা হাঁটতেই হাঁপিয়ে উঠে।

৪২. উড়ো কথা (গুজব) – উড়ো কথায় কান দিও না।

৪৩. উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) – রহিম সাহেবের উড়নচণ্ডী ছেলেটি অল্পদিনেই বাপের সম্পত্তি নষ্ট করে পথে দাঁড়িয়েছে।

৪৪. উড়োচিঠি (বেনামী চিঠি) – চেয়ারম্যান সাহেব উড়োচিঠি পেয়ে একেবারে মুষড়ে পড়েছেন।

৪৫. উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (একজনের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপানো) – রহিমের খাতা দেখে লিখে করিম করল পাশ আর রহিমের গেল নম্বর কাটা –এ যেন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

এ

৪৬. এক চোখা (পক্ষপাতিত্ব) – গাঁয়ের মোড়ল একচোখা, তার কাছে সুবিচার পাবে কী করে?

৪৭. এলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন) – ছেলের জন্মদিনে এতবড় আয়োজন, এ যে এক এলাহি কাণ্ড।

৪৮. এক ঢিলে দুই পাখি (একসঙ্গে দুই কাজ করা) – রফিক এক ঢিলে দুই পাখি মারতে গিয়ে কোনো কাজই করতে পারলো না।

৪৯. এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ একবারই আসে না)– যেই টাকাটা পেয়েছ, আর দেখা নাই তবে এক মাঘে শীত যায় না, ওকে আবার আসতেই হবে।

৫০. একাদশে বৃহস্পতি (সুসময়) – তোমার তো একাদশে বৃহস্পতি, যাতে হাত দাও তাতেই সোনা ফলে।

৫১. এক কথার মানুষ (প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকে) – আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এক কথার মানুষ।

৫২. একহাত নেওয়া (সুযোগ বুঝে প্রতিশোধ নেয়া) – কায়দায় ফেলে নাকি আমাকে এক হাত দেখে নেবে।

৫৩. একক্ষুরে মাথা মুড়ান (একই প্রকৃতির) – তোমরা সবাই একই কথা বলছ, সকলেই কী এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছ।

ও

৫৪. ওষুধ ধরা (কাজ হওয়া) – মনে হয় ওষুধ করেছে– বুড়োটা এবার কথামতো কাজ করবে।

ক

৫৫. কথার কথা (গুরুত্বহীন কথা) – কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য একথা বলিনি, এ নেহায়েতই কথার কথা।

৫৬. কত ধানে কত চাল (হিসেব করে চলা) – তোমাকে তো উপার্জন করে সংসার চালাতে হয় না আমি উপার্জন করে সংসার চালাই– তাই জানি কত ধানে কত চাল।

৫৭. কড়ায় গণ্ডায় (পুরোপুরি) – আগে কড়ায় গণ্ডায় পাওনা বুঝিয়ে দাও তারপরে তোমার অন্য কথা।

৫৮. কেতাদুরস্ত (পরিপাটি) – করিম পোশাকে কেতাদুরস্ত হলে কী হবে লেখাপড়া তো কিছুই জানে না।

৫৯. কান পাতলা (বিশ্বাসপ্রবণ) – লোকটির ভয়ানক কান পাতলা, যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে।

৬০. কথায় চিড়া ভিজা (বিনা ব্যয়ে কাজ না হওয়া) – কথায় কী আর চিড়ে ভিজে, কিছু টাকা পয়সা ছাড়, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।

৬১. কেঁচে গন্ডুষ করা (পুনরায় আরম্ভ) – সবই ভুলে গেছি– এখন ছোট ভাইকে অঙ্ক করাতে গিয়ে কেঁচো গন্ডুষ করতে হচ্ছে।

৬২. কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন) – ঠিকাদারি করা কাঁচা পয়সা তো তাই দুহাতে উড়াচ্ছে।

৬৩. কপাল ফেরা (অবস্থা ভালো হওয়া) – ওর কপাল ফিরেছে, এখন ভালো টাকা-পয়সা উপার্জন করে।

৬৪. কান ভারি করা (কুপরামর্শ দেওয়া) – আমার বিরুদ্ধে নানান কথা বলে ও বড় সাহেবের কান ভারি করেছে।

৬৫. কলুর বলদ (পরাধীন) – দিনরাত কলুর বলদের মতো সংসারের ঘানি টানছি, তবু কারো নেক নজরে পড়িনি।

৬৬. কই মাছের প্রাণ (যে সহজে মরে না) – চোরটির কই মাছের প্রাণ, না হলে এত মার খেয়েও মরল না।

৬৭. ক অক্ষর গোমাংস (বর্ণ পরিচয়হীন) – ওতো একটা ক অক্ষর গোমাংস লেখাপড়া কিছুই জানে না।

৬৮. কাক ভুষণ্ডী (দীর্ঘায়ু) – বুড়িটা কাক ভুষণ্ডী– না হলে এত দিন ভিটে আগলে পড়ে আছে।

৬৯. কল্কে পাওয়া (পাত্তা পাওয়া) – ঐ বিদ্যা নিয়ে এখানে কল্কে পাওয়া যাবে না– অন্য চাকরির চেষ্টা করো।

৭০. কাঁঠালের আমসত্ব (অসম্ভব বস্তু) – হিংসার পৃথিবীতে শান্তি এখন কাঁঠালের আমসত্বের মতোই অসম্ভব বস্তু।

৭১. কূপমণ্ডুক (সীমাবদ্ধ জ্ঞান) – মানুষের চাঁদ বিজয়ের কথাও শোননি– তুমি তো আচ্ছা কূপমণ্ডুক।

৭২. কাঠের পুতুল (নির্বাক ও অসাড়) – কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? দেখছ না ছেলেটা পুকুরে ডুবে যাচ্ছে।

৭৩. কংস মামা (শত্রুভাবাপন্ন নিকট-আত্মীয়) – কৎস মামার লোকেরা তোমার চারপাশে অশুভ ছায়া ফেলেছে, সাবধানে থেকো।

৭৪. কালেভদ্রে (কদাচিৎ) – শহরবাসীরা কালেভদ্রে গ্রামের বাড়িতে পা রাখে।

৭৫. কচুবনের কালাচাঁদ (অপদার্থ) – তোমার মতো কচুবনের কালাচাঁদের হাতে মেয়ে দেবে কে?

৭৬. কেষ্ট বিষ্টু (গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) –দলীয় সম্মেলনে কেষ্ট বিষ্টুরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করলেন।

খ

৭৭. খয়ের খাঁ (চাটুকার) – তুমি তো বড় সাহেবের খয়ের খাঁ, তুমি আমাদের আন্দোলনে আসবে না।

৭৮. খাল কেটে কুমির আনা (বিপদ ডেকে আনা) – ভাইয়ে-ভাইয়ের বিবাদে প্রতিবেশী ডেকে নিয়ে এসে খাল কেটে কুমির এনেছ, এখন ঠ্যালা সামলাও।

গ

৭৯. গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) – আমি তোমাদের মতো গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে চাই না, নিজের মতো করে নিজে বাঁচতে চাই।

৮০. গলগ্রহ (পরের বোঝা স্বরূপ) – আমি কারো গলগ্রহ নই, গায়ে খেটে নিজের অন্ন জোগাড় করি।

৮১. গোবর গণেশ (মূর্খ) – ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ, বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।

৮২. গোঁফ খেজুরে (অলস) – সে যা গোঁফ খেজুরে লোক, ঢাকনা খুলে হাঁড়ির ভাতটুকু নিয়েও খেতে পারবে না।

৮৩. গোড়ায় গলদ (আরম্ভে ভুল) – অঙ্ক মিলবে কী করে, গোড়াতেই যে গলদ করে বসে আছ।

৮৪. গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) – ভেবেছিলাম এবার ভালো ফসল পাব কিন্তু সে গুড়ে বালি, বান সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

৮৫. গা ঢাকা দেওয়া (লুকিয়ে থাকা) – পুলিশের ভয়ে ও গা ঢাকা দিয়েছে।

৮৬. গায়ের ঝাল ঝাড়া (শোধ দেওয়া) – অনেকদিন পর বদমায়েশটার দেখা পেয়ে আচ্ছা করে গায়ের ঝাল ঝেড়েছি।

৮৭. গোকুলের ষাঁড় (বাধাবন্ধনহীন) – বাপের হোটেলে খাওদাও আর গোকুলের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াও, বলি লেখাপড়া কি একেবারে ছেড়েই দিয়েছ!

৮৮. গোঁয়ার গোবিন্দ (কাণ্ডজ্ঞানহীন) – ছেলেটা একটা গোঁয়ার গোবিন্দ– নইলে ছোট ভাইটিকে এরকম করে মারে!

৮৯. গৌরচন্দ্রিকা (ভণিতা) – ওসব গৌরচন্দ্রিকা রেখে আসল কথাটি কী তা বলে ফেল।

৯০. গা তোলা (উঠা) – এবার গা তুলুন ট্রেন আসবার সময় হয়েছে।

৯১. গো বৈদ্য (হাতুড়ে) – গ্রামে গো বৈদ্যের হাতে পড়ে কত সাধারণ রোগী যে মারা যাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে।

৯২. গভীর জলের মাছ (চালাক) – রহিম গভীর জলের মাছ– তার মতলব বোঝা কি আমার সাধ্য।

৯৩. গোবরে পদ্ম ফুল (অস্থানে ভালো জিনিষ) – দিন মজুরের ছেলে কিন্তু লেখাপড়ায় এত ভালো– এ যে দেখছি গোবরে পদ্মফুল।

৯৪. গরিবের ঘোড়ারোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত করতে যাওয়া) – সামান্য আয়ের কেরানির গাড়ি কেনার শখ, গরিবের ঘোড়ারোগ ছাড়া আর কী।

৯৫. গদাই লস্করি চাল (অলস ভঙ্গি) – এমন গদাইলস্করি চালে হাঁটলে ট্রেন ধরতে পারবে না।

৯৬. গো-বেচারা (নিরীহ) – আজকাল সমাজে গো-বেচারা লোকের মর্যাদা নেই।

৯৭. গোঁজামিল (কোনমতে মেলানো) – কোন কিছুতে গোঁজামিল দিলে তার পরিণাম ভাল হয় না।

ঘ

৯৮. ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত করা) – দুবেলা ভাত জোটে না, এদিকে প্রতি রাতে সিনেমা দেখার শখ, এ ঘোড়া রোগ ছাড়া আর কী!

৯৯. ঘটি ডোবে না নাম তালপুকুর (অপদার্থের বড় নাম) – ভাত জোটে না, নামে জমিদার! এ যে দেখছি ঘটি ডোবে না নাম তালপুকুর।

১০০. ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ) – গরিব বলে কি ঘাটের মড়ার কাছে মেয়ে সমর্পণ করব?

১০১. ঘোড়ার ডিম (বৃথা, অর্থহীন) – সারা বছর লেখাপড়া না করলে পরীক্ষার খাতায় ঘোড়ার ডিম তো পাবেই।

চ

১০২. চিনির বলদ (ভারবাহী কিন্তু লাভের অংশীদার নয়) – সংসারে দিনরাত খেটে মরছি কিন্তু চিনির বলদের মতো লাভের লাভ কিছুই পাই না।

১০৩. চোখ টাটান (হিংসা করা) – পরের উন্নতি দেখলে তোমার চোখ টাটায় কেন?

১০৪. চোখের চামড়া (লজ্জা) – তোমার চোখের চামড়া থাকলে এ মিথ্যা কথাটা আর বলতে না।

১০৫. চাঁদের হাট (সুখের মিলন) – পুত্র কন্যাদের নিয়ে তোমার সংসারে চাঁদের হাট বসেছে।

১০৬. চোখের বালি (অপ্রিয়) – ও চোখে মুখে মিথ্যা কথা বলে ওর চোখের পর্দা বলে কিছু নেই।

১০৭. চোখে ধুলা দেওয়া (ঠকানো) – মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ পয়সা কামাচ্ছ; কিন্তু এটা চিরদিন চলবে না।

১০৮. চক্ষুদান করা (চুরি করা) সামনের টেবিল থেকে কলমটা কে যে চক্ষুদান করলো ঠিক বুঝতে পারিনি।

১০৯. চোখে সরষের ফুল দেখা (হতভম্ব) – পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পড়েনি– কাজেই চোখের সরষের ফুল দেখছি।

১১০. চোখের মনি (প্রিয়) – মায়ের চোখের মনিকে কখনো আড়াল হতে দেন না।

১১১. চোখের মাথা খাওয়া (না দেখা) – তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ, সামনে দিয়ে একটা অপরিচিত লোক বাসায় ঢুকল আর তুমি দেখলে না।

১১২. চুল পাকানো (অভিজ্ঞতা) – এই কাজ করেই চুল পাকিয়েছি– তোমার কাছে নতুন করে শিখতে হবে না।

১১৩. চড় মেরে গড় (সর্বনাশ করে সম্মান দেখান) – মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আমার সর্বস্ব নষ্ট করলে এখন এসেছো সান্ত্বনার কথা বলতে, একেই বলে চড় মেরে গড়।

১১৪. চক্ষুশূল (অসহ্য) – সপত্নীপুত্র বিমাতার চক্ষুশূল হবে, এতো জানা কথা।

১১৫. চশমখোর (নির্লজ্জ) – তোমার মতো চশমখোর লোক আমি জীবনে দেখিনি।

১১৬. চুনোপুটি (সামান্য ব্যক্তি) – রাঘব বোয়ালরা ভয়ে কম্পমান, আর তুমি বাপু চুনোপুটি হয়ে লাফাচ্ছ।

১১৭. চোখের চামড়া (চক্ষুলজ্জা থাকা) – চোখের চামড়া থাকলে বাপের কাছে এমন নির্লজ্জ আবদার সে করতে পারত না।

১১৮. চোরাবালি (প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ) – লোভের চোরাবালিতে পড়ে তার ইহকাল ও পরকাল দুইই গেল।

১১৯. চাঁদের হাট (আত্মীয় স্বজন নিয়ে সুখের মিলন) – পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্র নিয়ে অভীর ঘরে চাঁদের হাট বসেছে।

ছ

১২০. ছকড়া নকড়া (সস্তা দর) – বাজারে ইলিশ মাছের আমদানি বেশি, তাই ছকড়া নকড়া দরে বিক্রি হচ্ছে।

১২১. ছেলের হাতে মোয়া (সহজলভ্য) – একি ছেলের হাতে মোয়া– চাইলেই পেয়ে যাবে।

১২২. ছা পোষা (পোষ্য ভারাক্রান্ত) – ছা পোষা মানুষ আমি, নুন আনতে পান্তা ফুরায়, আমার কি আর বিদেশ ভ্রমণে শখ করলে চলে!

১২৩. ছাই চাপা আগুন (প্রচ্ছন্ন প্রতিভা) – ছাই চাপা আগুন কোনো দিন ঢাকা থাকে না, একদিন প্রকাশ পাবেই।

১২৪. ছিনিমিনি খেলা (অপব্যয় করা) – সমিতির টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, তা হতে দেব না।

১২৫. ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (যে ব্যক্তিকে শুধু অপ্রিয় কাজ করানোর জন্যেই স্মরণ করা হয়) – সুসময়ে আমার খোঁজ নেবে কেন, আমি তো আছি দুঃসময়ের সাথি, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর দরকার হবেই।

জ

১২৬. জিলিপির প্যাচ (কুবুদ্ধি)– তোমার পেটে এত জিলিপির প্যাচ – ক্ষতি আমার করবেই।

১২৭. জগদ্দল পাথর (গুরুভার) – নাবালক ভাইদের সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব জগদ্দল পাথরের মতো আমার ঘাড়ে চেপে আছে।

১২৮. জগাখিচুড়ি (সবকিছু এলোমেলো, বিশৃঙ্খল হয়ে থাকা) – গুছিয়ে বলতে না পারার জন্য ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত জগাখিচুড়ি হয়ে গেল।

ঝ

১২৯. ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মেশা (সুযোগ পাওয়া মাত্র নিজের দলে ফেরা) – গরিবদের জন্য অনেক করলাম কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত আমাকে তাড়া করে ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশে গেল।

১৩০. ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ বুঝে কার্যসিদ্ধি করা) – ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে অতি কঠিন কাজেও সফলতা লাভ করা যায়।

ট

১৩১. টনক নড়া (সজাগ হওয়া) – পরীক্ষা সামনে –এতদিনে তোমার টনক নড়েছে।

১৩২. টাকার গরম (ধনসম্পদের অহংকার) – টাকার গরম দেখিয়ে সমাজে যা খুশি করবে তা হতে দেব না।

১৩৩. টাকার কুমির (ধনী) – লোকটা টাকার কুমির কিন্তু গরীব দুখীদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

১৩৪. টই টুম্বর (তরল বস্তুতে পরিপূর্ণ) – বর্ষাকালে বাংলাদেশের খাল-বিল, মাঠ-প্রান্তর, নদী-নালা সব পানিতে টই-টুম্বর হয়ে যায়।

১৩৫. টুপ ভুজঙ্গ (নেশায় চুর) – আরে, কাকে কী বলছ, দেখছ না নেশা করে একেবারে টুপ ভজঙ্গ হয়ে এসেছে।

১৩৬. টক্কর দেওয়া (পালøা দেওয়া) – যার তার সাথে টক্কর দিতে যেও না, শেষে বিপদে পড়বে।

ঠ

১৩৭. ঠোঁট কাটা (বেহায়া) – ও ছেলের ঠোঁট কাটা, মুরুব্বির সামনেও বেফাঁস কথা বলে ফেলতে পারে।

ড

১৩৯. ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু) – তুমি ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ নাকি, আর যে দেখাই পাওয়া যায় না।

১৪০. ডান হাতের ব্যাপার (আহার) – দুপুরে বেরোবার আগে ডানহাতের ব্যাপারটা সেরেই যাই, কখন ফিরব তার তো ঠিক নেই।

১৪১. ডামাডোল (বিশৃঙ্খলা) – যুদ্ধের ডামাডোলে চোরাকারবারিরা দুহাতে পয়সা লুটছে।

১৪২. ডাকা বুকো (দুঃসাহসী) – তোমার বাবা ছিলেন রীতিমতো ডাকা বুকো মানুষ, আর তুমি হলে কী না ভীরু ও দুর্বল।

১৪৩. টিমে তেতালা (অলস ভঙ্গি) – যেভাবে টিমে তেতালা গতিতে কাজ করছে, তাতে শেষ হবে বলে তো মনে হয় না।

ঢ

১৪৪. ঢাক ঢাক গুড় গুড় (কপটতা) – অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় করছো কেন! যা বলবে বলে ফেল।

১৪৫. ঢাকের কাঠি (মোসাহেব) – কেরানি তো বড় সাহেবের ঢাকের কাঠি, যা বলবে তাই শুনবে।

১৪৬. ঢাকের বাঁয়া (অকেজো) – ছেলের বিয়ের যোগাড় করেছে মা, বাবাটি তো ঢাকের বাঁয়া।

ত

১৪৭. তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) – ওদের মধ্যে এত দহরম মহরম কিন্তু সামান্য স্বার্থের টানাপোড়নেই বন্ধুত্ব তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল।

১৪৮. তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত) – লোকগুলো সেই সকাল থেকে তীর্থের কাকের মতো বসে আছে– কিন্তু যিনি বস্ত্রদান করবেন তার দেখাই নেই।

১৪৯. তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা (হঠাৎ অতিশয় রাগান্বিত হওয়া) – পাওনা টাকা চাইতেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

১৫০. তালপাতার সেপাই (রোগা) – ছেলেটি তো তালপাতার সেপাই – কী করে সেনাবাহিনীতে সুযোগ পাবে।

১৫১. তুলসী বনের বাঘ (ভণ্ড) – দেখতে সাধুর মতো হলে কী হবে, লোকটা আসলে তুলসী বনের বাঘ।

১৫২. তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) – সে যে লম্বা কথা বলে তার মূলে আছে তামার বিষ।

১৫৩. তাল সামলানো (আকস্মিক বিপদ ঠেকানো): বাবার মৃত্যুতে সজল তাল হারিয়ে ফেললেও এখন তাল সামলিয়ে উঠতে পেরেছে।

১৫৪. তালকানা (হুঁশ নেই যার) – তোমার মতো তালকানা ছেলের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে।

১৫৫. তুষের আগুন (দীর্ঘস্থায়ী ও দুঃসহ যন্ত্রণা) – পুত্র শোক পিতার বুকে তুষের আগুনের মতো জ্বলছে।

১৫৬. তেলা মাথায় তেল দেয়া (ধনীর হাতে আরও ধন তুলে দেওয়া) – তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই ওস্তাদ।

দ

১৫৭. দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠতা) – দুজনে খুব দহরম মহরম– এমন কি সব সময় এক সঙ্গেই থাকে।

১৫৮. দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) – এখন টাকা আছে তাই দুধের মাছির অভাব নেই।

১৫৯. দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার (তুমুল কাণ্ড) – বিয়ে বাড়িতে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার ঘটে গেল– ছেলের বাবা বিয়ে না দিয়েই বরকে নিয়ে চলে গেলেন।

১৬০. দাঁও মারা (মোটা অঙ্ক লাভ করা) – হঠাৎ চালের দাম বেড়ে যাওয়ায়, চালের দোকানদাররা ভালো দাঁও মেরেছে।

১৬১. দুধে ভাতে (ভালো অবস্থায় থাকা) – সব মা-বাবাই চায় তার সন্তানেরা দুধে ভাতে থাকুক।

১৬২. দায়সারা (অনিচ্ছুক ভাবে কাজ করা) – দায়সারাভাবে কাজ করলে কি আর কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়।

১৬৩. দু'মুখো সাপ (যে উভয় পক্ষের মিত্র সেজে থাকে, আসলে উভয়েরই শত্রু)– দু'মুখো সাপকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, সে যে কখন সর্বনাশ করবে তার ঠিক নেই।

ধ

১৬৪. ধামাধরা (চাটুকারিতা) – জলিল তো বড় সাহেবের ধামাধরা– ও কি আর আমাদের সঙ্গে থাকবে।

১৬৫. ধরাকে সরা জ্ঞান করা (তুচ্ছ জ্ঞান করা) – হঠাৎ কিছু কাঁচা পয়সা হাতে এসেছে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান কোরো না।

১৬৬. ধনুর্ভংগ পণ (অটল প্রতিজ্ঞা) – কোনো অবস্থাতেই অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করব না– এরূপ ধনুর্ভংগ পণই জাতিকে দৃঢ় ও উন্নত করতে পারে।

১৬৭. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে বা ধর্মের ঢাক আপনি বাজে (অন্যায় আপনিই প্রকাশিত হবে) – কোনো সত্যকে জোর করে চাপা দেওয়া সাময়িকভাবে সম্ভব হলেও দীর্ঘদিন তা চাপা থাকে না; কারণ ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

১৬৮. ধর্মের ষাঁড় (নিষ্কর্মা, নিশ্চিন্ত বেকার) – তুমি তো আস্ত একটা ধর্মের ষাঁড়।

১৬৯. ধান ভানতে শিবের গীত (এক কাজ করতে বা বলতে গিয়ে অন্য কাজ করা বা বলা) – যে কাজ করতে এসেছ তা না করে তুমি তো দেখছি, ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করে দিয়েছ।

১৭০. ধকল সওয়া (সহ্য করা) – তুমি যা-ই বল না কেন, এ বয়সে এত বড় ধকল সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ন

১৭১. নয় ছয় (অপচয়) – দুদিনেই ছেলেটা পৈতৃক সম্পত্তি নয় ছয় করে উড়িয়ে দিল।

১৭২. ননীর পুতুল (শ্রম বিমুখ অপদার্থ) – ছেলেগুলোকে অতিরিক্ত আদর দিয়ে ননীর পুতুল করে তুলেছ, ওরা জীবন পথে চলবে কী করে!

১৭৩. নেই আঁকড়া (নাছোড়বান্দা) – পড়েছি নেই আঁকড়াদের হাতে চাঁদা না দিয়ে কি রক্ষে আছে।

১৭৪. নবমীর পাঠা (যার সামনে আসন্ন বিপদ) – কর্তাবাবুর সামনে অপরাধী চাকরটি নবমীর পাঠার মতো কাঁপতে লাগল।

১৭৫. নবাব খাজা খাঁ (অতিশয় বিলাসী) – দুটো টাকা হাতে না আসতেই একেবারে নবাব খাজা খাঁ হয়ে বসেছ। এভাবে চললে রাজভাণ্ডারও শেষ হতে দেরি হবে না।

১৭৬. নাছোড়বান্দা (যার চাহিদা না মিটিয়ে উপায় নেই) – তুমি তো দেখছি বাপু একেবারে নাছোড়বান্দা, শেষ পর্যন্ত চাঁদা আদায় করে ছাড়লে।

১৭৭. নাড়ি নক্ষত্র জানা (আনুপূর্বিক সমস্ত কিছু জানা) – আমি চৌধুরী পরিবারের নাড়ি নক্ষত্র জানি, আর তুমি এসেছ এ ব্যাপারে আমাকে ওয়াকিবহাল করতে।

১৭৮. নাড়ির খবর (সকল খবর) নাড়ির খবর জেনেই তবে আমি একাজ করব।

১৭৯. নিজের কোলে ঝোল টানা (নিজের প্রাপ্য অনুচিতভাবে বেশি করে দেখানো)– চেয়ারম্যান সাহেব সমাজের উন্নতি করবেন কী, তিনি সব ব্যাপারে নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত।

১৮০. নজর লাগা (দৃষ্টিতে নষ্ট হওয়া) – নজর লেগে ছেলেটি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

১৮১. নিমরজি (অল্পরাজি) – দলে আসবে বলে লোকটা নিমরাজি হয়েছে।

প

১৮২. পটল তোলা (মারা যাওয়া) – জনতার হাতে বেদম মার খেয়ে চোরটা গত রাতে পটল তুলেছে।

১৮৩. পরের ধনে পোদ্দারি (পরের টাকায় বাহাদুরি) – পরের ধনে পোদ্দারি সবাই করতে পারে– নিজের টাকা খরচ করে করলে বুঝতাম বাহাদুরি।

১৮৪. পুকুর চুরি (ব্যাপক চুরি) – একটু আধটু হলে না হয় বুঝতাম, এ যে পুকুর চুরি– গোটা প্রতিষ্ঠানটাই বেমালুম গায়েব।

১৮৫. পোয়াবারো (সুসময়) – মিলের ম্যানেজার অফিসে নেই, ছোটকর্তার তো এখন পোয়াবারো।

১৮৬. পায়াভারী (অহংকার) – এম.এ-তে ভালো রেজাল্ট করে তোমার পায়াভারী হয়েছে বুঝি।

১৮৭. পাথরে পাঁচ কিল (নিরাপদ ও উন্নত অবস্থা) – নিজে মোটা মাইনের চাকরি কর, ব্যবসা থেকে প্রচুর আয় আসছে, তোমার তো এখন পাথরে পাঁচ কিল।

১৮৮. পুঁটি মাছের প্রাণ (ক্ষীণ প্রাণ) – ওতো পুঁটি মাছের প্রাণ– ওকে ধমক ধামক দিয়ে কী লাভ।

১৮৯. পারের কড়ি (পরকালের জন্য সঞ্চয়) – সংসারের মোহে পরকালের কথা ভুলে গেলে চলবে না, পারের কড়ি সংগ্রহ করা দরকার।

১৯০. পিঠ টান দেওয়া (ভয়ে পালিয়ে যাওয়া) – জনগণের প্রতিরোধের মুখে পিঠ টান দিতে বাধ্য হলো নেতারা।

১৯১. পগার পার (পালিয়ে যাওয়া) – পুলিশ আসবার আগেই চোর পগার পার হলো।

ফ

১৯২. ফতে নবাব (নবাবি চালের নির্ধন ব্যক্তি) – ওর পোশাক-আশাক দেখে ভুলো না ও একটা ফতে নবাব।

১৯৩. ফুলবাবু (সৌখিন সজা-সজ্জাধারী) – ফুলবাবু সেজে ঘুরে বেড়ালে পেটের ভাত যোগাড় হবে কোত্থেকে।

ব

১৯৪. বউ কাঁটকী (বৌকে যে জ্বালাতন করে) – বৌটিকে সারাদিন খাটায়– এমন বৌ কাঁটকী শাশুড়ী তো দেখিনি।

১৯৫. বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী) – বড় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব আর বালির বাঁধ সমান– এই খুশি এই নারাজ।

১৯৬. বক ধার্মিক (ভণ্ড) – লোকটি দেখতে সাধুর মতো হলে কী হবে আসলে একটা বকধার্মিক– লোকের সর্বনাশ করতে জুড়ি নেই।

১৯৭. বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুষ) – অফিসে বাঁ হাতের ব্যাপার খুব চলছে– স্বাভাবিকভাবে কোনো কাজই হতে চায় না।

১৯৮. বাঘের দুধ (দুষ্প্রাপ্য বস্তু) – টাকা হলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

১৯৯. বুকের পাটা (সাহস) – বয়স কম হলে কী হবে, ছেলেটার বুকের পাটা আছে, না হলে তুফানের মধ্যে এত বড় নদী সাঁতরে পার হতে পারে।

২০০. বুদ্ধির ঢেঁকি (বোকা) – ও যে বুদ্ধির ঢেঁকি, ওকে দিয়ে এ শক্ত কাজ হবে না।

২০১. ব্যাঙের আধুলি (অতি সামান্য ধন) – ব্যাঙের আধুলি পেয়েই এত লাফাচ্ছ– বেশি টাকা পেলে কী করবে ভেবে পাচ্ছি না।

২০২. ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব) – ডাকাতকে দেখাচ্ছ পুলিশের ভয়? ব্যাঙের কোনো দিন সর্দি হয় নাকি!

২০৩. বিসমিলøায় গলদ (গোড়ায় ভুল) – অঙ্ক মিলবে কী করে, বিসমিলøায় গলদ করে বসে আছ।

২০৪. বড় মুখ (গর্ব) – বড় মুখ করে এসেছিলাম, ফিরিয়ে দিও না ভাই!

২০৫. বাগে পাওয়া (আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া) – এবার তোমাকে বাগে পেয়েছি – সহজে ছাড়ছিনে।

২০৬. বিনা মেঘে বজ্রপাত (আকস্মিক বিপদ)– পুত্রের মৃত্যু সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই।

২০৭. বসন্তের কোকিল (সুসময়ের বন্ধু) – টাকা পয়সা হাতে দেখলেই বসন্তের কোকিলরা ভিড় জমায়।

২০৮. বাদুড় ঝোলা (বাদুড়ের ন্যায় ঝুলে থাকা) – লোকজনের ভিড়ে বাসে উঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পা-দানিতে দাঁড়িয়ে বাদুড় ঝোলা হয়ে যেতে হলো।

২০৯. বিড়াল তপস্বী (ভণ্ড) – বৃদ্ধ বয়সে সাধু সেজে যারা সারা জীবনের পাপকে ঢাকতে চাচ্ছে, বিড়াল তপস্বী তারাই।

২১০. বিষবৃক্ষ (অন্যায়ের কেন্দ্রভূমি) – নিজের হাতে বিষবৃক্ষ রোপণ করলে তার ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে।

২১১. বিদুরের খুদ (শ্রদ্ধার সামান্য দান) – আমার এ বিদুরের খুদ দিয়ে যদি সমাজের কোনো মঙ্গল হয় তাহলে নিজকে ধন্য মনে করব।

ভ

২১২. ভরাডুবি (সব হারান) – পাটের দাম পড়ে গিয়ে ব্যবসায়ের ভরাডুবি হয়েছে – এখন একরকম সর্বসান্ত।

২১৩. ভস্মে ঘি ঢালা (অপাত্রে দান) – তোমার মতো অপদার্থকে অর্থসাহায্য করা আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

২১৪. ভূষণ্ডির কাক (দীর্ঘায়ু) – ভূষণ্ডির কাক এই বুড়িটা মরেও না, তার রোগ শোকও ভালো হয় না।

২১৫. ভুঁইফোড় (অর্বাচীন) – রবীন্দ্রনাথের নাটক নির্বাচন না করে ভুঁইফোড় লেখকের নাটক নির্বাচন করেছ কেন?

২১৬. ভিজা বিড়াল (কপট) – ওতো একটা ভিজা বিড়াল, চেহারা শান্ত হলেও পেটে যত শয়তানি বুদ্ধি।

২১৭. ভিটায় ঘুঘু চরান (সর্বনাশ করা) – তুমি আমার পেছনে লেগেছ– তোমার ভিটায় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব।

২১৮. ভানুমতির খেল (ভোজবাজি, ভেল্কি) – খুব তো ভানুমতির খেল দেখালে, তুমি যে এমন ফাঁকিবাজ তা আগে জানলে তোমাকে এ কাজের ভার দিতাম না।

২১৯. ভাগের মা গঙ্গা পায় না (অনেকের ওপর একই দায়িত্ব থাকলে সেটা আদৌ পালিত হয় না) – পাঁচ গ্রাম মিলে নাটকের মহড়া দিলে, এখন মঞ্চস্থ করতে টাকা নেই। সাধে কী কথায় বলে– ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

২২০. ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (প্রচুর ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও কাজের কোনো সার্থকতা নেই) – পরের টাকা হাতে পেলে অযথা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করতে বাধে না।

২২১. ভূতের বেগার (অহেতুক শ্রম) – সারাটা জীবন অফিসে ভূতের বেগার খেটে গেলাম, লাভ পেলাম না কিছুই।

২২২. ভেরেণ্ডা ভাজা (অকাজের কাজ) – হাতে কাজকর্ম নেই তা বলে বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজছি।

ম

২২৩. মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ) – ওর কথায় যত মধুই থাক ও মিছরির ছুরি।

২২৪. মগের মুলুক (অরাজক দেশ) – একি মগের মুলুক পেয়েছ যা খুশি তাই করবে।

২২৫. মাছের মা (নির্মম) – তুমি তো মাছের মা, নিজের ছেলের জন্যও তোমার মায়া মমতা নাই।

২২৬. মান্ধাতার আমল (পুরনো আমল) – মান্ধাতার আমলের নয়, আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর চাষাবাদ করে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করতে হবে।

২২৭. মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য) – দেখতে সুন্দর হলে কী হবে, আসলে ও মাকাল ফল, গুণ বলতে কিছু নেই।

২২৮. মাছের মায়ের পুত্রশোক (লোক দেখানো কৃত্রিম সহানুভূতি) – নিজের ছেলে মরলে কাঁদল না, সতীনের ছেলের জন্য কান্নাকাটির শেষ নেই – একেই বলে মাছের মায়ের পুত্র শোক।

২২৯. মাটির মানুষ (সরল ব্যক্তি) – রামবাবু সত্যি মাটির মানুষ, সকলের প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করেন।

২৩০. মাথার মণি (পরম সমাদরে রাখা ব্যক্তি) – আমাদের অধ্যক্ষ সকালের মাথার মণি।

২৩১. মাথা খাওয়া (প্রশ্রয় দিয়ে নষ্ট করা) – ছেলেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে তারা মাথা খেয়েছে।

২৩২. মেও ধরা (বিপদ ঠেকানো) – সবাই যার যার ভাবে চলে গেল, মেও ধরার কেউ নেই।

২৩৩. মণিকাঞ্চন যোগ (অপূর্ব মিল) – যেমন সুশিক্ষিত ছেলে তেমনি সুশিক্ষিতা মেয়ে, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।

২৩৪. মামাবাড়ির আবদার (অতিরিক্ত দাবি যা যুক্তিসংগত নয়) – এটা মামাবাড়ির আবদার পেয়েছ যা খুশি তাই চাবে?

য

২৩৫. যত গর্জে তত বর্ষে না (আড়ম্বরের অনুপাতে ফল সামান্য) – তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যত গর্জে তত বর্ষে না; সেলিম সাহেব যতটা রেগে গিয়েছিলেন তার তুলনায় প্রতিফল সামান্য।

২৩৬. যমের অরুচি (এমন ব্যক্তি যাকে যমও ছোঁয় না) – বুড়োটা পায়খানা প্রসাব করে একাকার করে রাখে, মরণ তার হয় না, সে একেবারে যমের অরুচি।

র

২৩৭. রাঘব বোয়াল (অতি ক্ষমতাধর) – ওতো একটা রাঘব বোয়াল, সুযোগ পেলে সহায় সম্পত্তি সবই গিলে খাবে।

২৩৮. রুই-কাতলা (গণমান্য লোক) – এখানে অনেক রুই-কাতলা এসেছিল, আমার মতো সামান্য লোকের জায়গা হবে কী করে?

২৩৯. রগচটা (বদরাগি) – রগচটা লোকের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা কঠিন কাজ।

২৪০. রক্তের টান (স্ববংশ প্রীতি) – প্রত্যেক মানুষেরই আপন জনের প্রতি রক্তের টান আছে।

২৪১. রাখে আলøাহ মারে কে (বিপদ থেকে যে রক্ষা পাবার মতো সে রক্ষা পাবেই) – লঞ্চ ডুবে অনেকে মারা গেল, আমি ভাসমান কাঠ ধরে কোনো রকম বেঁচে গেলাম। রাখে আলøাহ মারে কে।

২৪২. রাবণের চিতা (অনির্বাণ শোক) – উপর্যুপরি তিনটি ছেলের মৃত্যুশোক বৃদ্ধের বুকে রাবণের চিতার মতো জ্বলছে।

ল

২৪৩. লেফাফা দুরস্ত (বাইরের পরিপাটি ভাব) – লোকটা পোশাকে আশাকে লেফাফাদুরস্ত কিন্তু লেখাপড়া একটুও জানে না।

২৪৪. লম্বা দেওয়া (পালিয়ে আত্মরক্ষা) – পুলিশ দেখা মাত্র চোরটা লম্বা ছিল।

শ

২৪৫. শাঁখের করাত (উভয় সংকট) – আমার হয়েছে শাঁখের করাত –এখন হ্যাঁ বললেও বিপদ না বললেও বিপদ।

২৪৬. শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ) – সামনের মাসে চাকুরি থেকে অবসর নেব, এখন আমার শিরে সংক্রান্তি; তোমার সঙ্গে বসে আড্ডা দেবার সময় নেই আমার।

২৪৭. শকুনি মামা (অসৎ বুদ্ধিদাতা আত্মীয়) – অসৎ কাজে প্রেরণা দিতে শকুনি মামারা চিরকালই লেগে আছে।

২৪৮. শাপে বর (আপাতদৃষ্টিতে মন্দ হলেও পরিণামে যা ভালো) – চৌধুরী বাড়ির শিক্ষিতা মেয়ের সাথে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার শফিক মনে কষ্ট পেলেও এ তার পক্ষে শাপে বর হয়েছে, কারণ মেয়েটির নাকি ক্যান্সার।

২৪৯. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (নিন্দনীয় কাজ গোপন করার চেষ্টা) – ছেলের কুকর্ম ঢাকতে গিয়ে মিথ্যা বললেন হাজি সাহেব, শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়।

২৫০. শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র ভরসা) – বিধবার একমাত্র ছেলেটি তার শিবরাত্রির সলতে।

২৫১. শিয়ালের যুক্তি (নিরর্থক পরামর্শ) – ধূর্ত ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা ঠিক নয়, কারণ তারা শিয়ালের যুক্তি দিয়ে হয়রানি করতে ওস্তাদ।

ষ

২৫২. ষোলকলা (সম্পূর্ণ) – জীবনে যা কাম্য সবই পেয়েছেন তিনি– বলা চলে ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে তাঁর।

স

২৫৩. সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিলন) – যেমন বর তেমন কনে, একেই বলে সোনায় সোহাগা।

২৫৪. সাপে নেউলে (শত্রুভাব) – দু ভাইয়ে এখন সাপে-নেউলে ভাব, কেউ কারো মুখদর্শন পর্যন্ত করে না।

২৫৫. সরস্বতীর বরপুত্র (বিদ্বান) – সরস্বতীর বরপুত্ররা একটা দেশ ও জাতির গৌরব।

২৫৬. সবুরে মেওয়া ফলে (ধৈর্য্যলব্ধ সুফল) – এতে অধৈর্য হলে চলবে কেন, তুমি তো জানো সবুরে মেওয়া ফলে।

২৫৭. সাত পাঁচ (নানা রকম) – সাত পাঁচ ভাববার সময় নেই, শত্রু দোর গোড়ায়, এখনই বেরিয়ে পড়।

২৫৮. সোনার পাথর বাটি (অসম্ভব ব্যাপার) – যে সংবাদ তুমি পরিবেশন করলে তা সোনার পাথর বাটির মতোই অসম্ভব ও অলীক।

২৫৯. সুখের পায়রা (সৌভাগ্যের সহচর এবং দুর্দিনে যে থাকে না) – সুদিনে সুখের পায়রা চারদিক ঘিরে থাকে।

হ

২৬০. হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা ফাঁস করা) – আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে তোমার সব গোপন কথা ফাঁস করে দেব।

২৬১. হাত টান (চুরির অভ্যাস) – টাকা পয়সা সাবধানে রাখ, চাকরটার হাত টানের অভ্যাস আছে।

২৬২. হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খলা) – অফিসের ফাইলপত্র সব হ-য-ব-র-ল হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

২৬৩. হাতে খড়ি (আরম্ভ) – ব্যবসায়ে ছেলেটার হাতে খড়ি দিলাম, কিছু করে খেতে হবে তো।

২৬৪. হরিষে বিষাদ (আনন্দে বিষাদ) – যেদিন চাকরি পাবার খবর এল তার পরের দিনই বাবা মারা গেলেন – এ যে হরিষে বিষাদ।

২৬৫. হস্তীমূর্খ (বোকা) – তুমি একটা হস্তীমুর্খ –দেহ বিরাট হলে কী হবে মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই তোমার।

২৬৬. হাড়ে বাতাস লাগা (শান্তি পাওয়া) – চোরটা মরেছে; এবার গাঁয়ের লোকের হাড়ে বাতাস লাগবে।

২৬৭. হা পিত্যেশ (আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করা) – সেই সকাল থেকে তোমার জন্য হা পিত্যেশ করে বসে আছি, আর তুমি এলে কিনা রাত দশটায়।

২৬৮. হাতের পাঁচ (শেষ অবলম্বন) – না ভাই, হাতের পাঁচ এ ক'টি টাকা তোমাকে দিয়ে আমি ঝুঁকি নিতে রাজি নই।

২৬৯. হাঁড়ির হাল (অত্যন্ত দূরবস্থা) – ওমা, তোমার এ হাঁড়ির হাল অবস্থা কেমন করে হলো?

২৭০. হালে পানি না পাওয়া (কিছুতেই সুরাহা না করতে পারা) – দুর্দিনে আমার সংসারতরী হালে পানি পাচ্ছে না।

২৭১. হাড় হাভাতে (অভাবী) – তোমার এ হাড় হাভাতে অবস্থার জন্য তুমিই দায়ী।

২৭২. হাড়ে দুর্বা গজানো (লাঞ্ছনার একশেষ হওয়া) – ছেলেপেলেদের ব্যবহার আমার হাড়ে দুর্বা গজিয়েছে, আজ আমি অথর্ব হয়ে পড়ে আছি বলেই এ অবস্থা।

২৭৩. হিরের টুকরো (অতি মূল্যবান) – রশিদ সাহেবের ছেলেগুলো এক একটি হিরের টুকরো, লেখাপড়ায় সবাই ভালো।

২৭৪. হাঁড় জুড়ানো (শান্তি পাওয়া) – সতীনের ছেলে বিদেশ চলে যাওয়ায় আমার হাঁড় জুড়ালো।

২৭৫. হাড় হদ্দ (নাড়ি নক্ষত্র) – আমি তার হাড় হদ্দ সবই জানি।

২৭৬. হাতির খোরাক (বেশি খরচ) – এ সংসারে হাতির খোরাক যোগাতে আমি জীবনপাত করলাম, অথচ কেউ তার মূল্য দিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। বাগধারা বলতে কী বোঝায় লিখুন।

২। কোনো শব্দ বা শব্দসমষ্টির আক্ষরিক অর্থ ও বিশেষ অর্থের মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণ দিন।

৩। নিচের বাগধারাগুলোর অর্থ ডানে লিখুন।

বাগধারা	অর্থ	বাগধারা	অর্থ
বিসমিলøায় গলদ		অহিনকুল	
হাপিত্যেশ		ওষুধ ধরা	

ইতর বিশেষ		গোঁফ খেজুরে	
কান ভারি করা		অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী	
ছা পোষা		চক্ষুদান করা	
দহরম মহরম		বাঘের দুধ	
অর্ধচন্দ্র দান		লেফাফা দুরস্ত	
পোয়াবারো		মাছের মা	
বিনা মেঘে বজ্রপাত		হাতটান	
খয়ের খাঁ		আমড়াগাছি করা	
আকাশপাতাল		পরের ধনে পোদ্দারি	

৪। নিচের বাগধারাগুলো দিয়ে সার্থক বাক্য রচনা করুন।

ক. ইতর বিশেষ ----------

খ. অর্ধচন্দ্র দান ----------

গ. কান পাতলা ----------

ঘ. ঘোড়া রোগ ----------

ঙ. ছকড়া নকড়া ----------

পাঠ ৮.৪ : প্রবাদ প্রবচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রবাদ-প্রবচনের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রবাদ-প্রবচনের উদ্ভব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রবাদ-প্রবচনের গুরুত্ব লিখতে পারবেন।
- প্রবাদ-প্রবচন চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রবাদ-প্রবচনের যথার্থ ব্যবহার করতে পারবেন।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন ভাষার ব্যবহারে এমন কিছু উক্তি বা কথা বলে থাকি যা বহুদিন ধরে আমাদের সমাজে প্রচলিত এক-একটি বিশেষ ঘটনার সংক্ষিপ্তসার বা তাৎপর্যময় উক্তি। মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানপ্রসূত কালের আবর্তে গ্রহণযোগ্য সংক্ষিপ্ত অথচ ভাব প্রকাশক এসব উক্তিই প্রবাদ-প্রবচন। মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘটনা থেকে যে অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা অর্জন করে তা ছোট আকারে কথার মাধ্যমে সূতীক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে গণউক্তিমূলক প্রবাদ-প্রবচনে রূপ নেয়। আবার জ্ঞানী ব্যক্তিদের নীতি-উপদেশমূলক কথাও প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– ধর্মের কল বাতাসে পড়ে। অথবা– যেমন কর্ম, তেমন ফল। প্রথম প্রবাদটি নীতিকথামূলক এবং দ্বিতীয়টি মানব চরিত্রের সমালোচনামূলক। উভয় প্রবাদ-প্রবচনই মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও চিন্তার ধারাবাহিক ফসল।

মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানপ্রসূত কালের আবর্তে গ্রহণযোগ্য সংক্ষিপ্ত অথচ ভাব প্রকাশক উক্তিই প্রবাদ-প্রবচন।

প্রবাদ-প্রবচন দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। তবে সব ক্ষেত্রেই যে এর অর্থ চিরসত্য বা সুনির্দিষ্ট হবে তা বলা যায় না। যেমন– 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' –এর সঙ্গে 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল শ্রেয়' এর অর্থ-পার্থক্য দেখা যায়।

কালের প্রবর্তনে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রবাদ-প্রবচনের উদ্ভব হয়েছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মুখ থেকে যেমন এসব বাক্য উৎসারিত হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবীদের লেখা থেকেও এগুলো একটা সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। বিভিন্ন গ্রাম্য লেখক বা কবিয়ালদের উক্তি থেকেও এগুলো এসেছে। এছাড়া ডাক ও খনার বচন, বিভিন্ন জনশ্রুতি, মেয়েলি ছড়া, লোকসাহিত্য এবং সর্বোপরি আমাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, রীতিনীতি, চালচলন ও বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এগুলোর উদ্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই প্রবাদ-প্রবচনের প্রচলন রয়েছে। ভাব প্রকাশের সহায়ক হিসেবে এসবের গুরুত্ব অনেক। প্রবাদ-প্রবচনের অর্থব্যঞ্জনা অর্থাৎ কম কথায় গভীর ভাব প্রকাশের প্রক্রিয়া রয়েছে, যা মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সহায়ক। এগুলো ব্যবহারযোগ্য ভাষায় সরল ও সুচারু আকারে প্রয়োগ করা যায়। শুধু তাই নয়, ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার বহুকাল ধরে চলে আসছে। মানুষের মুখে মুখে চলে আসা অজ্ঞাত মানুষের তৈরি এসব

প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতা, নীতিকথা, ইতিহাস, সমালোচনা ও সমাজের রীতিনীতি ইত্যাদির প্রকাশ রসযোগ্য করে তুলে ধরা হয়।

নিচে প্রবাদ-প্রবচন ও তার অর্থের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেয়া হলো–

১. অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী – অল্প শিক্ষিত ব্যক্তির গর্ব বেশি।
২. অভাবে স্বভাব নষ্ট – অভাবে পড়লে স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়।
৩. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট – বেশি লোভ করলে সর্বস্ব হারাতে হয়।
৪. অতি দর্পে হত লঙ্কা – অহংকার পতনের মুল।
৫. অতি চালাকের গলায় দড়ি- বেশি চালাকি করতে গেলে নিজেরই বিপদ হয়।
৬. অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট – বেশি লোকের উপস্থিতি বিশৃঙ্খলা আনে।
৭. অল্পশোকে কাতর অধিক শোকে পাথর – সামান্য শোকে মানুষ কাতর হয়ে কান্নাকাটি করে, কিন্তু অধিক শোকে হতবাক ও স্তব্ধ হয়ে যায়।
৮. অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায় – হতভাগা লোক যে কাজই করে সেই কাজেই বিফল হয়।
৯. অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ – বেশি বাড়াবাড়ি কুমতলবের পরিচয়।
১০. অর্থই অনর্থের মূল – অর্থের লোভ খারাপ কাজকে টেনে আনে।
১১. অসারের তর্জন-গর্জন সার – ক্ষমতাহীনের নিরর্থক আস্ফালন।
১২. আলালের ঘরের দুলাল – অতি আদুরে ছেলে।
১৩. আটে-পিঠে দড়, তবে ঘোড়ায় চড় – যোগ্যতা অর্জন করে কাজে হাত দেওয়া উচিত।
১৪. আঠার মাছে বছর – দীর্ঘসূত্রিতা।
১৫. আদার ব্যাপারির জাহাজের খবর – সাধারণ লোকের বিরাট বিষয়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ।
১৬. আপনি বাঁচলে বাপের নাম – আত্মরক্ষাই প্রথম কর্তব্য।
১৭. আপনি শুতে ঠাঁই নেই, শঙ্করকে ডাকে – নিজের বাঁচতে হয় অন্যের অনুগ্রহে, আবার আর একজনকে সাথি করা বা সাহায্য দিতে যাওয়া।
১৮. আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়া সইতে হয় – কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।
১৯. ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় – দৃঢ় মনোবল সফলতা লাভের সহায়ক।
২০. ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় – অপরকে মারতে গেলে নিজেকেও মার খেতে হয়।
২১. উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায় – শুরুতেই বোঝা যায় ফলটা কী দাঁড়াবে। ছোটবেলাতেই টের পাওয়া যায় বড়ো হলে কী হবে।
২২. উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে – একজনের দোষ আরেকজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া।
২৩. উলুবনে মুক্তা ছড়ানো – অপাত্রে দান বিফলে যায়।
২৪. এক মাঘে শীত যায় না – বিপদ একবারেই শেষ হয়ে যায় না।
২৫. উনা ভাতে দুনা বল – কম খেলেই শরীর ভাল থাকে।
২৬. এক হাতে তালি বাজে না – বিবাদে দু'পক্ষের ভূমিকা থাকে।
২৭. এক ঢিলে দুই পাখি মারা – এক উপায় অবলম্বন করে দুই কাজ সমাধা করা।
২৮. ওল বলে মান কচু, তুমি বড়ো লাগো – একজন বেশি দোষী, কম-দোষীকে দোষের জন্যে গালি দেয়।
২৯. কনের ঘরে পিসি, বরের ঘরের মাসি – পক্ষের আপন লোক হিসেবে কাজ করে, উভয়কেই লেলিয়ে দিয়ে নিজে ভালো থাকার মানসিকতার কুটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি।

৩০. কয়লা যায় না ধুলে স্বভাব যায় না মরলে – খল তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না।
৩১. কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না – পরিশ্রম বা সাধনা না করলে জীবনে সাফল্য আসে না।
৩২. কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা – অল্প বয়সে পেকে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া।
৩৩. কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস – ছেলেবেলায় সুশিক্ষা না দিয়ে বড়ো হয়ে দিতে চাইলে আর সে গ্রহণ করতে চায় না।
৩৪. কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে ছাড়ে রা – সহজে স্বভাব ছাড়া যায় না।
৩৫. কানা গরু বামুনকে দান – দুষ্ট ব্যক্তির এমন দান, যা কারো প্রয়োজনে লাগে না।
৩৬. কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন – যার যেই গুণ নেই, তার প্রতি সেই গুণ আরোপ করা।
৩৭. কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরালেই পাজি – স্বার্থসিদ্ধির পর অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করা।
৩৮. কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ – কারো সুসময়, কারো আবার দুঃসময়।
৩৯. খিদে পেলে বাঘে ধান খায় – প্রয়োজনের গুরুত্ব বোঝানো।
৪০. গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না – আপন লোকেরা গুণীর কদর করে না।
৪১. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল – কাজ শুরুর আগেই ফল ভোগের জন্য তৈরি।
৪২. গরু মেরে জুতো দান – কারও অনিষ্ট করে আবার তার সাহায্যে এগিয়ে আসা।
৪৩. গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়া – কোনো বিপজ্জনক কাজে এগিয়ে দিয়ে তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া।
৪৪. গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল – নিজেকে নেতা বলে জাহির করা।
৪৫. ঘোড়া দেখে খোঁড়া – সুযোগ বুঝে অক্ষম সাজা।
৪৬. ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায় – একবার যে বিপদে পড়েছে, পরে অল্পেই সে আতংকিত হয়।
৪৭. ঘর থাকতে বাবুই ভেজা – নিজের সম্পদ থাকতেও কষ্ট করা।
৪৮. ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো – বিনা লাভে কোনো কর্ম করা।
৪৯. চকমক করলেই সোনা হয় না – চেহারা দেখেই কারো বা কোনো কিছুর ভালোমন্দ বিচার করা যায় না।
৫০. চাঁদেরও কলঙ্ক আছে – নিজের দোষ লাঘবের চেষ্টা।
৫১. চেনা বামুনের পৈতা লাগে না – পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় পত্র দরকার হয় না বা তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না।
৫২. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – প্রয়োজনের সময় সমস্যা সমাধানের উপায় না হয়ে পরে তা সমাধানের উপায় বের হয়।
৫৩. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই – মন্দ লোকের সাথে মন্দ লোকের বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক।
৫৪. চোরের ওপর বাটপাড়ি – প্রতারকের ওপর দিয়ে প্রতারণা করা।
৫৫. চোরের মার বড়ো গলা – দোষী ব্যক্তির দোষ ঢেকে সাধু সাজতে সাহায্য করা ও বাগাড়ম্বর করা।
৫৬. চোরের সাক্ষী গাঁট-কাটা – খারাপ লোকেই খারাপ লোককে সাহায্য করে।
৫৭. ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা – সামান্য লাভের জন্যে মন্দ কাজে হাত না দেয়া।
৫৮. জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ – দুদিকে বিপদ।
৫৯. ঝড়ে বগ মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে – অপরের দ্বারা সাধিত কর্মের কৃতিত্ব নিজের বলে জাহির করা।
৬০. ঝি-কে মেরে বউকে শেখানো – একজনকে মেরে অন্যকে শেখানো।
৬১. ঝোপ বুঝে কোপ মারা – সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।
৬২. ডুবে ডুবে জল খাওয়া – গোপনে গোপনে কোনো কাজ সম্পন্ন করা
৬৩. ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সরদার – ক্ষমতা নেই, অথচ আস্ফালন আছে।
৬৪. ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে – যার যা স্বভাব সে তাই-ই করে যায়।

৬৫. দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ – একতাবদ্ধভাবে কাজে নেমে ব্যর্থ হলেও তাতে লজ্জা বা গøানির কোনো কারণ নেই।

৬৬. দশের লাঠি একের বোঝা – একজনের জন্য যে কাজ কষ্টসাধ্য অনেকে মিলে করলে সে কাজ সহজ হয়ে যায়।

৬৭. দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না – সুখের অভাব না ঘটলে সুখের বিষয়টাকে অনুভব করা যায় না।

৬৮. দিনে-দুপুরে ডাকাতি – প্রকাশ্যে অন্যায় করা।

৬৯. দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষা- আদর দিয়ে শত্রুকে লালন করা।

৭০. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে – পরিণামে সত্যের জয় হয়।

৭১. ধর্মের ঢাক আপনি বাজে – সত্য কখনো চাপা থাকে না, আপনিই প্রকাশিত হয়।

৭২. ধান ভানতে শিবের গীত – মূল কথা ছেড়ে বাজে প্রসঙ্গ আলোচনা করা।

৭৩. ধরি মাছ না ছুঁই পানি – কষ্ট এড়িয়ে কার্যোদ্ধার।

৭৪. ধরাকে সরা জ্ঞান করা – অতি অহংকারে বা ক্ষমতার দম্ভে বড়োকে ছোট মনে করা।

৭৫. নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না – কেবল নামেই আছে ভেতরে নেই।

৭৬. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা – নিজের ব্যর্থতা অন্যের ঘাড়ে চাপানো।

৭৭. নিজের পায়ে কুড়াল মারা – নিজের ক্ষতি করা।

৭৮. নুন খায় যার গুণ গায় তার – উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও তার পক্ষে কাজ করা।

৭৯. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা – নিজের ক্ষতি করেও অপরের অনিষ্ট সাধন করা।

৮০. পাপের দান প্রায়শ্চিত্যে যায় – অসৎ উপার্জন অসৎ পথেই যায়।

৮১. পায় না, তাই খায় না – অভাবে কোনো জিনিষের প্রতি কপট অনীহা প্রকাশ।

৮২. পেটে খেলে পিঠে সয় – লাভের সম্ভাবনা থাকলে অনেক কষ্ট সহ্য করা যায়।

৮৩. বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা – দুষ্ট লোকের পালøায় পড়লে কিছু-না কিছু ক্ষতি হবেই।

৮৪. বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড় – কর্তার চেয়ে কর্মচারির তেজ বেশি।

৮৫. বিনা মেঘে বজ্রপাত – হঠাৎ বিপদ উপস্থিত হওয়া।

৮৬. বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো – বাইরে কাড়কাড়ি ভিতরে ঢিলেমি।

৮৭. বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি – যে সংশিøষ্ট ব্যক্তি দু'পক্ষেই কথা বলে।

৮৮. বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া – যা পাওয়ার আশা নেই তা লাভ করা।

৮৯. বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর – সামর্থ্য নেই অথচ লাফ-ঝাঁপ বেশি।

৯০. ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া – যা এমনিতেই পাওয়া যায় তাতে দোষ-ত্রুটি থাকলেও কিছু যায় আসে না।

৯১. ভাগের মা গঙ্গা পায় না – দায়িত্ব ভাগ না করে যদি একই কাজে সবার দায়িত্ব থাকে তো সে কাজ সুসিদ্ধ হয় না।

৯২. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন – যেভাবে হোক কাজে সফল হওয়ার প্রতিজ্ঞা।

৯৩. মরা হাতি লাখ টাকা – যোগ্য ব্যক্তি দুর্যোগে পড়লেও অন্তঃসারশূন্য হয় না।

৯৪. মশা মারতে কামান দাগা – সামান্য কাজের জন্য বিরাট আয়োজন।

৯৫. মুখে চুন কালি পড়া – অপমানিত হওয়া।

৯৬. মোলøার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত – সীমার অতিরিক্ত কাজ কেউ করতে পারে না।

৯৭. যার লাঠি তার মাটি – জোর যার মুলুক তার।

৯৮. যতোক্ষণ শ্বাস ততোক্ষণ আশ – যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বাঁচে, ততোক্ষণই সে আশা রাখে।

৯৯. যার ধন তার নয়, নেপোয় মারে দুই – একজন খাটে, ফল ভোগ করে অন্য জন।

১০০. যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া – জিনিসের মালিককে সেই জিনিস নিয়ে জব্দ করা।

১০১. যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল – দুর্বৃত্তের উপযুক্ত শাস্তি।

১০২. যেমন কর্ম তেমন ফল – যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল পায়।

১০৩. যে সয় সে রয় – কষ্ট সহ্য করার যার ক্ষমতা আছে, জীবন-যুদ্ধে সে-ই জয়ী হয়।

১০৪. যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা – শত্রুর সব কাজেই দোষ হয়।

১০৫. যত গর্জে তত বর্ষে না – আড়ম্বর অনুযায়ী কাজ হয় না।

১০৬. যেখানে বাঘের ভয় যেখানে রাত হয় – বিপদের উপর বিপদ আসে।

১০৭. রথ দেখা ও কলা বেচা – একটা কাজ করতে গিয়ে সেই সঙ্গের আর একটা কাজ সমাধা করা।

১০৮. রাখে আলøা মারে কে – স্রষ্টা রক্ষা করলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না।

১০৯. সস্তার তিন অবস্থা – সস্তা জিনিস প্রায়ই খারাপ হয়।

১১০. সবুরে মেওয়া ফলে – ধৈর্য ধরে থাকলে সুফল পাওয়া যায়।

১১১. সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ – সৎ সঙ্গে পরিণাম ভালো কিন্তু অসৎ সঙ্গের পরিণাম খারাপ।

১১২. লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন – প্রয়োজনে অর্থ জোগানোর ব্যক্তি থাকলে তার ভরসায় বেশি খরচ করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ।

১১৩. সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে – যে যেই প্রকৃতির লোকের সাথে চলাফেরা করে সে সেই প্রকৃতির লোকের মেজাজ ভালোভাবে বুঝতে পারে ।

১১৪. সুখে থাকতে ভূতে কিলায় – দুঃখের অভিজ্ঞতা নেই, এমন ব্যক্তির দুঃখ ডেকে আনার মতো ব্যবহার বা আচরণ।

১১৫. সোনা ফেলে আঁচলে গিরো – মূল্যবান বস্তু বা ব্যক্তিকে অনাদর করে মূল্যহীন বস্তুর আদর।

১১৬. স্বভাব যায় না মলে ইজ্জত যায় না ধুলে – যাদের স্বভাবের পরিবর্তন হয় না তাদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ।

১১৭. হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী – অপদার্থ ব্যক্তির অপদার্থ সহকারী বা সমর্থক।

১১৮. হাতি ঘোড়া গেলো তল ভেড়া বলে কতো জল – বড়ো বড়ো লোক যে কাজ করতে পারেনি, সামান্য ব্যক্তির সে- ই কাজ করতে যাওয়ার স্পর্ধা।

১১৯. হাতির পাঁচ পা দেখা – অহংকারী ব্যক্তির স্পর্ধিত আচরণ।

১২০. হাত ঝাড়া দিয়ে পর্বত – বড়ো লোকের মুখের কথাতেই অনেক কিছু হয়।

১২১. হিসেবের গরু বাঘে খায় না – বিবেচনা থাকলে ঠকতে হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। প্রবাদ-প্রবচন বলতে কী বোঝায় লিখুন।

২। কোন কোন উৎস থেকে প্রবাদ-প্রবচনের উদ্ভব হয়েছে লিখুন।

৩। প্রবাদ-প্রবচনের গুরুত্ব লিখুন।

৪। নিচের প্রবাদ-প্রবচনগুলোর অর্থ লিখুন।

অল্পশোকে কাতর অধিক শোকে পাথর, আলালের ঘরের দুলাল, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, ওল বলে মান কচু, তুমি বড়ো লাগো, গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়া, চেনা বামুনের পৈতা লাগে না

৫। নিচের প্রবাদ-প্রবচনগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখান।

ঝি-কে মেরে বউকে শেখান, দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষা, নুন খায় যার গুণ গায় তার, বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা, হাতির পাঁচ পা দেখা

পাঠ ৮.৫ : পারিভাষিক শব্দ

ভূমিকা

আমরা যদি কম্পিউটার নিয়ে কোনো আলোচনা করি তাহলে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার, প্রোগ্রামিং, উইন্ডোজ, ডাটা, কমান্ড, হ্যাং, স্কিপ, ফাইল, ডিরেক্টরি এরকম বেশ কিছু শব্দ অবশ্যই আলোচনায় আসবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়, যে শব্দগুলো সাধারণভাবে আমাদের রোজকার কথা-বার্তায় ব্যবহৃত হয় না, বা প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু ওই বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় শব্দগুলোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রায় অনিবার্য। যেমন– কম্পিউটার সম্পর্কিত আলোচনায় আসে হ্যাং, ডাটা, স্কিপ, ফাইল ইত্যাদি শব্দ, তেমনি হয়তো অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় চাহিদা, যোগান, বাজার, মুদ্রা এসব শব্দ ঘুরেফিরে আসবে। অনেক সময় দেখা যায়, এই বিশেষ শব্দগুলোর ব্যবহার না করে ওই বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করাই যাচ্ছে না। এই শব্দগুলোই হচ্ছে পরিভাষা। হার্ডওয়্যার, সফট্ওয়্যার, ডাটাবেজ, হ্যাং এগুলো যেমন কম্পিউটার বিজ্ঞানের পরিভাষা, তেমনি বাজার, যোগান, চাহিদা, মুদ্রা এগুলো অর্থনীতির পরিভাষা। আর পরিভাষাগুলো যেহেতু এক একটি শব্দ সেজন্য আমরা সেগুলোকে পারিভাষিক শব্দও বলতে পারি। যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা এই পাঠে পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করব।

সাধারণ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটে পারিভাষিক শব্দ পড়া শেষে আপনি–

১. পরিভাষার সংজ্ঞার্থ বলতে পারবেন।
২. পারিভাষিক শব্দ চিনতে পারবেন।
৩. পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. পরিভাষার প্রয়োগবিধি লিখতে পারবেন।
৫. বাংলা পরিভাষা রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখতে পারবেন।
৬. পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৭. বাংলা ভাষায় প্রচলিত পরিভাষার একটি তালিকা তৈরি করতে পারবেন।

পাঠ ৮.৫.১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পরিভাষার সংজ্ঞার্থ বলতে পারবেন।
- পারিভাষিক শব্দ চিনতে পারবেন।
- পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

'পরিভাষা' শব্দটি আসলে ইংরেজি 'defination' শব্দের বাংলা অনুবাদ। এর কাছাকাছি আরেকটি শব্দ আমরা জানি 'technical term'-যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'পারিভাষিক শব্দ'। আজকাল 'পরিভাষা' ও 'পরিভাষিক শব্দ- প্রায় একই অর্থ বুঝিয়ে থাকে; যদিও 'পরিভাষা' এই বিশেষ্যবাচক শব্দটির বিশেষণ হচ্ছে 'পারিভাষিক'। পরিভাষা শব্দটি এদেশে ইংরেজ আসার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল সংজ্ঞাবাচক বিশেষ অর্থে। অর্থান্তর নেই এমন বিশেষ অর্থবোধক সংজ্ঞার নাম পরিভাষা। বস্তুত পরিভাষা বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহৃত এমন কিছু শব্দ যা সংশিøষ্ট বিষয়ের বিশেষ বিশেষ ধারণাকে যথার্থভাবে, নির্ভুলভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করে। পণ্ডিতেরা একমত হয়ে একটি বিশেষ ধারণার (concept) জন্য একটি বিশেষ শব্দকে বেঁধে দেন যে শব্দটি সংশয়হীনভাবে কেবল ওই বেঁধে দেওয়া অর্থকেই বোঝাবে অন্য কোনো অর্থ বোঝাবে না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট ও অদ্ব্যর্থ তাৎপর্য জ্ঞাপনকারী শব্দই হচ্ছে ওই বিশেষ জ্ঞানের পরিভাষা।

পরিভাষা হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের কাছে হাতিয়ার স্বরূপ, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠিক কথাকে ঠিকমতো বোঝানো; ইংরেজিতে যাকে বলে hitting the nail on the head সাধারণ শব্দের সঙ্গে পারিভাষিক শব্দের পার্থক্য এখানেই। একটি 'পরিভাষা' বা পারিভাষিক শব্দ একাধিক অর্থে যেমন ব্যবহৃত হতে পারবে না, তেমনি একাধিক ভাব নির্দেশের জন্য একই পরিভাষা ব্যবহৃত হতে পারবে না। যেমন 'সমাস' বললে পরস্পর অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট একাধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। কিংবা 'কারক' বললে বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য শব্দের কোনো না কোনো প্রকাশের সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। তাই 'সমাস' বা 'কারক' বাংলা ব্যাকরণ শাস্ত্রের দুটি পারিভাষিক শব্দ। তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, বাণিজ্য প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ব্যবহৃত হয় অসংখ্য পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ।

কীভাবে চিনবেন পারিভাষিক শব্দ

আজকাল আমরা জেনেই হোক আর না জেনেই হোক পদে পদে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এসব পারিভাষিক শব্দ আপনি চিনবেন কী করে? একটু আগেই আমরা বলেছি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই রয়েছে কিছু নিজস্ব পারিভাষিক শব্দ। যে শব্দগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কথাবার্তায় তেমন প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু ওই বিশেষ জ্ঞানের আলোচনায় শব্দটি যদি অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাহলেই বুঝতে হবে শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। মনে করুন আপনি সমাস সম্পর্কে আলোচনা করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি 'পূর্বপদ', 'পরপদ', 'সমস্যমান পদ', 'ব্যাসবাক্য' এসব শব্দের সাহায্য ছাড়া আপনি আলোচনাই করতে পারবেন না। সুতরাং আপনি ধরে নেবেন ওই শব্দগুলো পারিভাষিক শব্দ।

সব সময় পারিভাষিক শব্দ আবার এতো সহজে চেনা যায় না। কারণ পারিভাষিক শব্দটির বহুল ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা। উকিল, মোক্তার, আবাসিক, অনাবাসিক এগুলো যে পারিভাষিক শব্দ তা আজ আর আমাদের মনেই হয় না। একারণে পারিভাষিক শব্দ চেনার জন্য আমাদের প্রয়োজন খানিকটা অতিরিক্ত সতর্কতা। যখনই কোনো পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে

পরিচিত হবেন, শব্দটি একাধিকবার আবৃত্তি করে মনে গেঁথে নিন, প্রয়োজনে একটি নোট খাতায় আপনার পরিচিত পারিভাষিক শব্দগুলোর তালিকা তৈরি করুন।

পরিভাষা কেন প্রয়োজন

এক-একটি পরিভাষার সঙ্গে বিশেষ ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্মৃতি ধারণা-বোধ মিশে থাকে। সে সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের উপলব্ধি ও চেতনা। নাইট্রোজেন চক্র, শীতনিদ্রা, অভিযোজন ক্ষমতা, নিরক্ষীয় বায়ু, মরাকাটাল এ পারিভাষিক শব্দগুলো যেমন বিশেষ বিশেষ জ্ঞান-জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত তেমনি প্রতিটি শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের অনুভূতি। ফলে রসায়ন (এটি একটি পারিভাষিক শব্দ) সম্পর্কিত আলোচনায় শীতনিদ্রা ও অভিযোজন ক্ষমতা, ভূগোল (এটি একটি পারিভাষিক শব্দ) সম্পর্কিত আলোচনার বেলাতেই নিরক্ষীয় বায়ু ও মরাকাটাল শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। ফলে ওই পারিভাষিক শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত মানুষের মনে জড়িয়ে থাকে বিশেষ ধরনের অনুভূতি, যার ফলে বিজ্ঞানের পরিভাষাগুলো বাণিজ্যের আলোচনায় কিংবা ভূগোলের পরিভাষাগুলো রসায়নের আলোচনায় অচল। যেহেতু পরিভাষাগুলোর সঙ্গে মানুষের উপলব্ধি ও চেতনা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে তাই বিশেষ জ্ঞানের আলোচনায় ওই জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিভাষা অবশ্যই প্রয়োজন। যার সাহায্যে সহজেই বক্তব্যের মূলকথা পাঠকের বা শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করে দেয়া যায়। এজন্য রাজশেখর বসু বলেছেন, পরিভাষা মিশিয়ে ভাষাকে সংহত না করলে বিজ্ঞানী তার বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না। মোট কথা পরিভাষা ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা প্রায় অসম্ভব। পরিভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক-পাঠক বা বক্তা-শ্রোতার মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়া পরিভাষা ব্যবহারের ফলে তত্ত্বমূলক রচনার প্রকাশভঙ্গি শক্তিশালী ও সংহত হয়ে ওঠে।

পরিভাষা ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় যখন প্রচলিত শব্দটির কোনো বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও সেটি যদি অপ্রচলিত থাকে তবে পরিভাষার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। এ কথা সত্য যে, ভাষা চাপিয়ে দেবার বিষয় নয়। ভাষা প্রবহমান নদীর মতো। বিদেশি বা ইংরেজি শব্দ আমাদের ভাষায় এসেছে প্রচুর। যেটি গ্রহণ করবার তা গ্রহণ করেছে, আর যা বর্জন করবার তাও বর্জন করেছে। তাছাড়া পরিভাষা সুনির্দিষ্ট ও অর্থবহ বলেই তা প্রচলিত হয়েছে। অনেক সময় মূলভাষার শব্দ টেকসই থাকে না বলেও পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিকল্প ভাষা সহজবোধ্যতার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- পুলিশ, ফ্যান, এর প্রতিশব্দ অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত বলেই পরিভাষা ব্যবহার না করে উপায় নেই।

সারসংক্ষেপ

পরিভাষা সংক্ষেপে কোনো বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করে, পণ্ডিতগণের সম্মতির মাধ্যমে স্থিরীকৃত, একটি মাত্র ভাবকেই কেবল প্রকাশ করে, একাধিক ভাবকে প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় না এবং মূলের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হলেও তার প্রযুক্ত অর্থই শব্দটির যথার্থ পারিভাষিক অর্থ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট ও অদ্ব্যর্থ তাৎপর্য জ্ঞাপনকারী শব্দই হচ্ছে ওই বিশেষ জ্ঞানের পরিভাষা। যখন প্রচলিত শব্দটির কোনো বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও সেটি যদি অপ্রচলিত থাকে তবে পরিভাষার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। অনেক সময় মূল ভাষা শব্দ টেকসই থাকে না বলেও পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। বিকল্প ভাষা সহজবোধ্যতার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- পুলিশ, ফ্যান, এর প্রতিশব্দ অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত বলেই পরিভাষা ব্যবহার না করে উপায় নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. পরিভাষার সংজ্ঞার্থ দিন।
২. পারিভাষিক শব্দ কীভাবে চেনা যায়?
৩. পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.৫.২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা পরিভাষা রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখতে পারবেন।
- পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিভাষার প্রয়োগবিধি লিখতে পারবেন।

বাংলা পরিভাষা রচনার ইতিহাস

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে যখন প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই সৃষ্টি হয় পরিভাষার। ওই যে একটি কথা বলা হয় যে, প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী– একথাটি যেন পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরো বেশি সত্যি বলে মনে হয়। যে দেশ বা জাতি নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যত বেশি নিবেদিত তাদের জন্য পরিভাষার প্রয়োজন তত বেশি এবং তারা তৈরি করেন বা করতে বাধ্য হন নতুন সব শব্দ। বিগত দুশো বছরে দেশি ও বিদেশি প্রশাসক, সাহিত্যিক ও বিশেষজ্ঞদের সমবেত চেষ্টায় গড়ে উঠেছে বাংলা পরিভাষা এবং এখনো সেই চেষ্টা শেষ হয়নি। এদেশে প্রথমে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয় মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বঙ্গপ্রদেশে। শাসনযন্ত্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থা এদেশে চালু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। ইংরেজি ভাষায় রচিত বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়েই অনুবাদকেরা অনুভব করেন পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা। এজন্য বলা যায়, আইন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাংলা পরিভাষা চর্চার সূত্রপাত ঘটে। ১৭৮৪ সালে জনাথান ডানকান 'মপসল দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতে বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম' বাংলা ভাষায় ও বাংলা হরফে ছেপে প্রকাশ করেন। ডানকানের পর এডমন স্টোন, ফরস্টার, উইলিয়াম কেরী প্রমুখের অনুবাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইংরেজি আইন বাংলায় রূপান্তর ঘটে। এই সকল বিদেশিদের প্রয়োজনের হাত ধরেই বাংলা ভাষায় আইনের আলোচনায় পরিচিত হয়ে ওঠে হাকিম, আদালত, ইজারা, জজ, তহশীল, তহশীলদার প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজ অনুবাদকদের হাতে সৃষ্ট ওই সব পারিভাষিক শব্দ এখন বাংলা ভাষার প্রায় নিত্য পরিচিত শব্দে পরিণত হয়েছে।

আইনের অনুবাদের মাধ্যমে পরিভাষা তৈরির যে সূচনা ঘটে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় তার পরবর্তী পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়। বাংলায় বিজ্ঞান পুস্তক রচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরির প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবিদার ফেলিকস্ কেরী। তিনি বাংলাতে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার খানিকটা বাংলা অনুবাদ করেছিলেন 'বিদ্যাহারাবলি' নাম দিয়ে। তাঁর অপর মূল্যবান গ্রন্থ 'ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা' প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালে। ওই বইতে তিনি যে সকল পরিভাষা তৈরি করেছিলেন সেগুলো এখনো আমরা ব্যবহার করছি। কয়েকটি উদাহরণ :

Anatomy – ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা	Solid – ঘন
Muscle – মাংস পেশী	Surgery – অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা
Nerve – নাড়ী	Vein –শিরা।

ফেলিকস কেরীর পর বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় অন্য যাদের অবদান রয়েছে তাঁরা হচ্ছেন জন ম্যাক, পীটার বৃটন, পীয়ারসন প্রমুখ।

বাঙালিদের মধ্যে যিনি বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা তৈরিতে মনোযোগী হন তিনি অক্ষয় কুমার দত্ত। উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানমনস্ক সাহিত্যিক। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক যে চারটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেগুলো হচ্ছে :

১। ভূগোল (১৮৪১); ২। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (প্রথম ভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয়ভাগ ১৮৫৯); পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬)। এসব বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি তৈরি করেন বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ। তাঁর সৃষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের নমুনা এখানে দেওয়া হলো–

Magnet – চুম্বক	Compass – দিগ্‌দর্শন
Solid – কঠিন	Biology – প্রাণিবিদ্যা
Microscope –অনুবীক্ষণ যন্ত্র	Botany –উদ্ভিদবিদ্যা
Telescope –দূরবীক্ষণ যন্ত্র	Southpole –কুমেরু
Astrology – জ্যোতিষ	North pole –সুমেরু

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অধিকাংশই পরবর্তীকালে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়েছে– আজো ব্যবহৃত হচ্ছে।

অক্ষয়কুমার দত্তের পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী দাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, বি.এন.শীল, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন শব্দের বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়ে বাংলা পরিভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা।

শুধু ব্যক্তিগত ভাবেই নয় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা প্রথম শুরু করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যোগ্য নেতৃত্বে একদল কৃতবিদ্য বাঙালি সম্মিলিতভাবে পরিভাষা তৈরির যে চেষ্টা করেছিলেন তা দীর্ঘ ৪২ বৎসর যাবত (১৮৯৪-১৯৩৫) পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়েছিল। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের শেষ দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি গঠনে করে (১৯৩৪) বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে খণ্ডে খণ্ডে তা প্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাজনের পর পশ্চিম বঙ্গ সরকার গঠন করে পরিভাষা সংসদ (১৯৪৮)। সংসদ বিভিন্ন ধরনের পরিভাষা নির্মাণের আত্মনিয়োগ করে। অন্যদিকে পূর্ববাংলার ভাষা কমিটি (১৯৪৮), বাংলা একাডেমি (১৯৫৭), কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (১৯৬৩), সরকারি শিক্ষা বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বাংলা পরিভাষা বহুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটিও (১৯৭৪) বাংলা পরিভাষা তৈরিতে বড় রকমের ভূমিকা রেখেছেন।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন পরিভাষা তৈরি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ ঘটছে নতুন নতুন শব্দের, আর আমরা পরিচিত হচ্ছি সে সব শব্দের সঙ্গে। ফলে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে শব্দটির একটি বাংলা পরিভাষার। যখনই প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তখনই হয়তো আমরা তৈরি করছি বা করতে বাধ্য হচ্ছি নতুন একটি পরিভাষা তৈরিতে। সঙ্গে সঙ্গে যোগ হচ্ছে আমাদের ভাষায় একটি নতুন শব্দ এবং সবার অজান্তেই ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি

যে কোনো পারিভাষিক শব্দেরই থাকতে হয় চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। সেগুলো হচ্ছে : সর্বজনস্বীকৃতি, স্বাভাবিকতা, বিশিষ্টার্থ প্রয়োগ, আড়ষ্টহীনতা। কিন্তু এই সব গুণসম্পন্ন শব্দ তৈরি করতে হলে, যিনি পরিভাষা তৈরি করবেন, তাঁকে অবশ্যই মেনে নিতে হয় ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো। তা ছাড়া ভাষাবিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কেও পরিভাষা সৃষ্টিকারীর থাকতে হয় পরিষ্কার ধারণা। এই ধারণার সাহায্যেই তিনি নির্বাচন করবেন এমন শব্দ যা সহজেই সমাজে গৃহীত হবে। দুরূহ ও দুরুচ্চার্য শব্দে পরিভাষা তৈরি হলে তা জনসাধারণের কাছে গৃহীত হয় না। তাছাড়া, আমরা আগেই বলেছি যে শব্দটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে তার থাকবে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অর্থ এবং স্পষ্ট তাৎপর্য। প্রত্যেকটি শব্দই একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে তাকে দ্বিতীয় কোনো অর্থে প্রয়োগ করা যাবে না।

পদ্ধতি

যে কোনো ভাষাতেই পরিভাষা তৈরি হয় সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। পদ্ধতি তিনটি হলো : ঋণ, ঋণ-অনুবাদ ও নির্মাণ। আসুন আমরা ঐ তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি।

১। ঋণ

ভাষার ঋণ মানুষকে ধনী ও সমৃদ্ধ করে। যে ভাষায় যতো বেশি ঋণকৃত শব্দ আছে সে ভাষা ততো সমৃদ্ধ। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অন্য সকলের মতো বাঙালিরও সমান অধিকার আছে। তাই যে ভাষা থেকে আমরা জ্ঞান আহরণ করব তার শব্দ, ভাব, প্রেরণা আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। উগ্র স্বাদেশিকতা দ্বারা তাড়িত হয়ে হাইড্রো অক্সাইডকে 'অম্লজানমূলক উদ্বায়ী গ্যাস', টেলিফোনকে 'দূরালাপনী', বুনসেন বার্নারকে 'পিনাল-দাহক', ইনকেজশনকে 'সূচিকাভরণ' না লেখাই সঙ্গত। আজকাল আমরা সবাই লোডশেডিং, চ্যারিটি বা ওয়ার্মআপ ম্যাচ, বাস, স্টেশন, অক্সিজেন এসব পারিভাষিক শব্দ অপরিবর্তিত ভাবেই গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ এসব শব্দ আমরা ঋণ করে বাংলা ভাষায় নিয়ে এসেছি এবং ঋণ শোধ না করলেও কেউ কখনো তাগাদা দিতে আসবে না; বরং বাংলা ভাষাকে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ করবে।

২। ঋণ-অনুবাদ

পুরনো, ভুলে যাওয়া কোনো বাংলা শব্দকে তুলে এনে নতুন অর্থে ব্যবহার করেও পরিভাষা তৈরি করা যায়। শব্দের আগের অর্থটা জানা থাকলে বা বহাল থাকলেও ধীরে ধীরে নতুন অর্থটাই সবার কাছে পরিচিতি পেয়ে, নতুন অর্থ ধারণ করে ফেলে। ঋণ-অনুবাদ হতে পারে দু-ধরনের। সংস্কৃত বা দেশি এমন অনেক শব্দ পাওয়া যাবে যেগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ অর্থ একটিই কিন্তু শব্দ অনেক। এ ধরনের শব্দগুলোর ভেতর থেকে একটি বেছে নিয়ে আমরা নতুন অর্থে প্রয়োগ করে গড়ে তুলতে পারি একটি পরিভাষা। 'বিজ্ঞান', ইতিহাস, পদার্থ প্রভৃতি শব্দ এমন ধরনের ঋণ অনুবাদের উদাহরণ। বিজ্ঞান শব্দটি বোঝাতো বিশেষ জ্ঞান– তা সে যে কোনো জ্ঞানকেই বোঝাতো কিন্তু এখন পরিভাষা হিসেবে আমরা বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করছি।

৩। নির্মাণ

শব্দ নির্মাণের মতো পরিভাষা নির্মাণের বেলাতেও ভাষার মূল প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি থেকে উপাদান মিশিয়ে পারিভাষিক শব্দ তৈরি করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ হতে গৃহীত পরিভাষা, যেমন : 'দ্রাঘিমা', 'বিষুবরেখা', 'লসাগু', 'গসাগু' ইত্যাদি শব্দ পরিভাষা হিসেবে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

পরিভাষিক শব্দ-প্রয়োগ বিধি

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা সর্বস্তরে চালু করার নির্দেশ দেয়া হলে সেই নির্দেশ অনুসারে বাংলা ভাষা সর্বস্তরে ব্যবহারের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। কিন্তু বাংলা ভাষা ব্যবহারের কিছু সমস্যা দেখা যায়। কারণ দীর্ঘদিন ধরে অফিস-আদালত ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার বহুল প্রচলন থাকায় কতিপয় শব্দ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় যা আমাদের বাংলা ভাষা সর্বত্র প্রচলনের ক্ষেত্রে দীনতারই পরিচায়ক। বহুল প্রচলিত এই সকল ইংরেজি শব্দ যার বাংলা প্রতিশব্দ উদ্ভব হয়নি বা কিছু কিছু শব্দ বাংলায় রূপান্তর হলেও তার ব্যবহার করা হয় সেগুলোকেই পরিভাষা বলা হয়।

প্রয়োগ বিধি

পরিভাষা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) মূল ভাষায় প্রতিশব্দ না থাকলে পরিভাষায় প্রয়োগ করা যায়। যেমন : পুলিশ চোরকে ধরতে এসেছে। পুলিশের প্রতিশব্দ নেই।

(২) মূলভাষায় টেকসই প্রতিশব্দ না থাকলে পরিভাষা প্রয়োগ করা হয়। যেমন :- ছেলেমেয়েরা টেলিভিশন দেখছে । টেলিভিশন শব্দের প্রতিশব্দ দূরদর্শন, তবে এ শব্দটি টেকসই নয়।

(৩) মূল ভাষায় প্রতিশব্দটি অপ্রচলিত হলে পরিভাষা প্রয়োগ করা হয়। যেমন : টেবিলে কলমটা রাখো। টেবিলের প্রতিশব্দ চৌপায়া এটি প্রচলিত নয়।

(৪) মুল ভাষার প্রতিশব্দটি সর্বসাধারণের বোধগম্য না হলে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন : গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪° ডিগ্রী সেলসিয়াস। ডিগ্রীর প্রতিশব্দ মান নির্ণয়ক বিশেষ বলে অভিহিত করা হয়। তাই ডিগ্রী লেখাই শ্রেয়।

(৫) পৌনঃপুনিক ব্যবহারের কারণে প্রতিশব্দ থাকলেও পরিভাষা প্রয়োগ করা যায়। যেমন : একাউনটেন্ট পদে লোক নিয়োগ করা হবে। একাউনটেন্ট এর প্রতিশব্দ হিসাব রক্ষক। কিন্তু একাউনটেন্ট এর ব্যবহার বহুল ও সর্বজনগ্রাহ্য।

(৬) সহজে গ্রহণযোগ্য পরিভাষা প্রয়োগ করা যায়। যেমন : টেলিফোন নষ্ট হয়ে গেছে। টেলিফোনের প্রতিশব্দ দূরালাপনি কিন্তু টেলিফোন শব্দটি সহজে গ্রহণযোগ্য।

(৭) অফিস আদালতে ব্যবহার্য শব্দ পরিভাষিক হওয়াই উত্তম। যেমন : বিল জমা দেয়া হোক। এখানে বিলের পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ প্রয়োগ তেমন অর্থবহ নয় না।

অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মূলভাষার প্রতিশব্দ সৃষ্টি করে শব্দের সার্বজনীনতা নষ্ট না করাই বাঞ্ছনীয়। সে ক্ষেত্রে পরিভাষা প্রয়োগ করা শ্রেয়। যেমন- স্কুল খোলা নেই। স্কুলের পরিবর্তে বিদ্যালয় শব্দ প্রয়োগ করলে সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ন হয়।

সারসংক্ষেপ :

ব্রিটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়েই বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের প্রথম উদ্যোক্তা িসেবে জনাথান ডানকানের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আইনের অনুবাদের পর বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরিতে প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবীদার ফেলিকস্ কেরী। বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরিতে অক্ষয়কুমার দত্ত অগ্রগণ্য। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক চারটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ওই চারটি বইতে তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তা আমরা এখনও সাদরে গ্রহণ ও ব্যবহার করে থাকি। অক্ষয়কুমার দত্তের পর ব্যক্তিগতভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীব্যক্তি বিভিন্ন প্রয়োজনে অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিভাষা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছে সেগুলো হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি প্রভৃতি।

যে কোনো ভাষাতেই পরিভাষা তৈরি হয় সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। পদ্ধতি তিনটি হলো : ঋণ, ঋণ-অনুবাদ ও নির্মাণ। কিছু শব্দ আমরা ঋণ করে বাংলা ভাষায় নিয়ে এসেছি। পুরনো ভুলে যাওয়া কোনো বাংলা শব্দকে তুলে এনে নতুন অর্থে ব্যবহার করেও পরিভাষা তৈরি করা যায়। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি থেকে উপাদান মিশিয়ে পারিভাষিক শব্দ তৈরি করা যায়। পরিভাষা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। বাংলা পরিভাষা রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখতে পারবেন।

২। পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩। পরিভাষার প্রয়োগবিধি লিখতে পারবেন।

৪। পরিভাষা তৈরির তিনটি পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

৫। টীকা লিখুন

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, অক্ষয়কুমার দত্ত, ফেলিকস্ কেরী, বাংলা একাডেমি।

পাঠ ৮.৫.৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের পারিভাষিক শব্দ বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার পারিভাষিক শব্দ লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিভিন্ন পরিভাষার একটি তালিকা তৈরি করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার বাংলা পরিভাষা

১.	President`s Secretariat অধিদপ্তর/পরিদপ্তর Bureau of Anti-corruption স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা Elcetion Commission Parliament Secretariat	১.	রাষ্ট্রপতির সচিবালয় দুর্নীতি দমন ব্যুরো নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ সচিবালয়
২.	Prime Minister`s Secretariat	২.	প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়
৩.	Ministry of Defence স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা Bangladesh Meteorological Department Inter-Service Public Relations Directorate	৩.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর।
৪.	Ministry of Communications স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা Bangladesh Road Transport Corporation	৪.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
৫.	Ministry of Post and Tele-Communication	৫.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
৬.	Ministry of Ports, Shipping and Inland Water Transport	৬.	বন্দর, সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়
৭.	Ministry of Education স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা National Curriculum and Text Book Board.	৭.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৮.	Ministry of Agriculture	৮.	কৃষি মন্ত্রণালয়
৯.	Ministry of Fisheries and Livestock.	৯.	মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়

১০.	Ministry of Irrigation, Water Development and Flood Control.	১০.	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়
১১.	Ministry of Finance	১১.	অর্থ মন্ত্রণালয়
১২.	Ministry of Planning	১২.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৩.	Ministry of Energy and Mineral Resources Bangladesh Power Development Board. Rulal Electrification Board.	১৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পলিø বিদ্যুতায়ন বোর্ড
১৪.	Ministry of Extablishment	১৪.	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
১৫.	Ministry of Foreign Affairs	১৫.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৬.	Ministry of Food	১৬.	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৭.	Ministry of Relief and Rehabilitation	১৭.	ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়
১৮.	Ministry of Health and Family Planning	১৮.	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৯.	Ministry of Home Affairs	১৯.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০.	Ministry of Commerce	২০.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২১.	Ministry of Industries	২১.	শিল্প মন্ত্রণালয়
২২.	Ministry of Jute	২২.	পাট মন্ত্রণালয়
২৩.	Ministry of Textiles	২৩.	বস্ত্র মন্ত্রণালয়
২৪.	Ministry of Information	২৪.	তথ্য মন্ত্রণালয়
২৫.	Ministry of Labour and Manpower	২৫.	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
২৬.	Ministry of Law and Justice	২৬.	আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়
২৭.	Ministry of Works	২৭.	পূর্ত মন্ত্রণালয়
২৮.	Ministry of Local Government Rural Development and Co-operatives.	২৮.	স্থানীয় সরকার, পলিø উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
২৯.	Ministry of Social Welfare and Women`s Affairs	২৯.	সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩০.	Ministry of Youth and Sports	৩০.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩১.	Ministry of Land	৩১.	ভূমি মন্ত্রণালয়
৩২.	Ministry of Religious Affairs.	৩২.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

A

Abandoned property	পরিত্যক্ত সম্পত্তি
Absconder	ফেরারি
Absorption	আত্মীকরণ
Abolish	বিলোপ করা
Abrogate	রদ করা
Absolutely	পুরোপুরি
Abstract	সার, সংক্ষিপ্ত
Account	হিসাব
Accounts Officer	হিসাব রক্ষণ অফিসার
Accused	আসামী
Acquired	হুকুমদখলকৃত/অধিগৃহীত
Acknowledge	স্বীকার করা
Acknowledgement due	প্রাপ্তি স্বীকারপত্র
Acting	ভারপ্রাপ্ত
Ad hoc appointment	এ্যাড্‌হক নিয়োগ
Administration	প্রশাসন
Administrator	প্রশাসক
Adult Franchise	প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার
Advertisement	বিজ্ঞাপন
Advice	পরামর্শ/উপদেশ
Adviser	উপদেষ্টা
Additional	অতিরিক্ত
Ad interim	অন্তর্বর্তীকালীন
Adjournment	মূলতবী
Adjusted	সমন্বিত
Admiral	নৌ-সেনাপতি
Adult education	বয়স্ক শিক্ষা
Advance	অগ্রিম
Agenda	আলোচ্যসূচি
Agreement	চুক্তি
Aid	সাহায্য
Alliance	মৈত্রীজোট
Allocate	বরাদ্দ করা
Allotment	বরাদ্দ
Allowance	ভাতা
Amended	সংশোধিত
Amendment	সংশোধন
Annexure	সংযুক্তি
Annual Confidential Report (ACR)	বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট
Antrhopology	নৃতত্ত্ব
Anticorruption	দুর্নীতি দমন
Appendix	পরিশিষ্ট
Applicant	আবেদনকারী
Argument	যুক্তি
Arrear	বকেয়া
Article	অনুচ্ছেদ
Assessee	করদাতা
Assessment	নির্ধারণ
Assessor	কর নির্ধারক
Assets	পরিসম্পদ
Associate	সহযোগী
Association	সংঘ
Attendance	হাজিরা
Attestation	সত্যায়ন
Attested	প্রত্যয়িত, সত্যায়িত
Audit	নিরীক্ষা
Authority	কর্তৃপক্ষ
Authorised	কর্তৃত্বপ্রাপ্ত
Autorgraph	স্বাক্ষর, স্বলেখন
Author	লেখক
Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত
Autonomy	স্বায়ত্তশাসন
Average	গড়

B

Baggage	মালপত্র
Bail	জামিন
Ballot	ভোট
Bank draft	ব্যাংক ড্রাফট
Bankrupt	দেউলিয়া
Basic Education	বুনিয়াদি শিক্ষা
Basic pay	মূল বেতন
Balance	বাকি, উদ্বৃত্ত
Bank balance	ব্যাংকস্থিতি
Bar Association	আইনজীবী সমিতি
Bar Council	আইনজীবী পরিষদ
Bargaining	দরকষাকষি
Biased	পক্ষপাত দুষ্ট
Bio data	জীবন বৃত্তান্ত
Biology	জীববিদ্যা
Birth control	জন্ম নিয়ন্ত্রণ
Biography	জীবনী

Blue print	প্রতিচিত্র, নীলনকশা
Black list	কালো তালিকা
Body search	দেহতলøাসি
Bond	মুচলেকা
Book-post	খোলা-ডাক
Budget allotment	বাজেট বরাদ্দ
Bureaucracy	আমলাতন্ত্র
Bumping	উঠানামা
By-law	উপআইন
By product	উপজাত
By-election	উপ-নির্বাচন

C

Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ
Calendar	বর্ষপঞ্জি
Cancel	বাতিল করা
Care of (C/O)	প্রযত্নে
Cash	নগদ
Cash-memo	ক্যাশ-মেমো
Casual leave	নৈমিত্তিক ছুটি
Calligraphy	হস্তলিপি বিদ্যা
Call money	তলবি টাকা
Capital	পুঁজি
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র
Certificate	প্রত্যয়ন/প্রমাণপত্র/সনদপত্র
Certified	প্রত্যয়িত
Chalan	চালান
Chancellor	আচার্য
Chief Justice	প্রধান বিচারপতি
Chief Guest	প্রধান অতিথি
Circular	পরিপত্র
Citizen	নাগরিক
Civil Court	দেওয়ানি আদালত
Clam	দাবি
Client	মক্কেল
Co-education	সহশিক্ষা
Consolidate	একত্রীকৃত
Cold storage	হিমাগার
Cold war	স্নায়ু যুদ্ধ
Collaborator	সহযোগী
Compensation	ক্ষতিপূরণ
Conduct	আচরণ
Conductor	পরিচালক
Conference	সম্মেলন
Confidential	গোপনীয়
Consent	সম্মতি
Contempt of court	আদালত অবমাননা
Cordon	বেষ্টনি
Credit	জমা
Criticism	সমালোচনা
Curriculum	পাঠক্রম
Customer	খদ্দের
Cyclone	ঘূর্ণিঝড়
Compulsory	বাধ্যতামূলক
Complimentary Copy	সৌজন্য সংখ্যা
Compromise	আপস

D

Daily Balance	দৈনিক জের
Debit Balance	খরচের জের
Defence	প্রতিরক্ষা
Defendant	বিবাদী
Deputation	প্রেষণ
Discrepancy	গরমিল
Discrimination	বৈষম্যমূলক
Dispensary	ঔষধালয়
Dock worker	ডক শ্রমিক
Duty	শুল্ক
Daily allowance	দৈনিক ভাতা
Data	উপাত্ত
Death rate	মৃত্যুহার
Debate	বিতর্ক
Debit	খরচ
Defamation	মানহানি
Defaulter	খেলাপি
Deficit	ঘাটতি
Deligation	প্রতিনিধিবর্গ
Demotion	পদাবনতি

Deposit	আমানত
Despatch	প্রেরণ করা
Design	নকশা
Diplomacy	কূটনীতি
Discharge	বরখাস্ত, খালাস
Dismiss	পদচ্যুত করা
Disolve	ভেঙে দেয়া
Dual	দ্বৈত
Due	বাকি, বকেয়া, দেয়
Due date	নির্দিষ্ট তারিখ
Duplicate	দ্বিতীয়ক, প্রতিরূপ
Duplicate copy	অনুলিপি

E

Earnest money	জামানত
Earned leave	অর্জিত ছুটি
Eid advance	ঈদ অগ্রিম
Edition	সংস্করণ
Editor	সম্পাদক
Editorial	সম্পাদকীয়
Educationst	শিক্ষাবিদ
e.g.	যেমন
Efficiency	সামর্থ্য, কর্মদক্ষতা
Employee	কমর্চারী
Employer	নিয়োগকর্তা
Enclosure	সংলগ্নী
Enchyclopaedia	বিশ্বকোষ
Employment	কর্মসংস্থান/চাকুরি
Enclosure	সংলগ্নী
Enquiry	তদন্ত
Enquiry Commission	তদন্ত কমিশন
Enrol	তালিকাভুক্ত করা
Enterpriser	উদ্যোক্তা
Entertainment	চিত্তবিনোদন
Environment	পরিবেশ
Envoy	দূত
Equation	সমীকরণ
Equipment	উপকরণ, সরঞ্জাম
Escort	প্রহরী/রক্ষী
Estimate	মূল্যানুমান, প্রাক্কলন
Ethics	নীতিমালা
Evaluation	মূল্যায়ন
Examine	পরীক্ষা
Excise	আবগারি
Excise duty	আবগারি শুল্ক
Export promotion	রপ্তানী উন্নয়ন
Exhibition	প্রদর্শনী
Exit	নির্গম
Ex-officio	পদাধিকারী
Extension	বৃদ্ধি
Expenditure	ব্যয়
Experiment	নিরীক্ষা, পরীক্ষণ
Expert	বিশেষজ্ঞ
Expiry	অবসান, মৃত্যু
Eye wash	ধোঁকা

F

Factories	কলকারখানা
Faculty	অনুষদ
Fair	মেলা, ন্যায্য
Fare	যাত্রী ভাড়া
Fiction	কথা সাহিত্য
Filing	নথিভুক্ত
First aid	প্রাথমিক চিকিৎসা
Fixation	স্থায়ী/স্থিরকরণ
Flaxible	নমনীয়
Formation	গঠন
Foreman	সর্দার, কর্মনায়ক
Forwarded	প্রেরিত
Founder	প্রতিষ্ঠাতা
Free market	খোলা বাজার/মুক্তবাজার
Free trade	অবাধ বাণিজ্য
Fundamental	মৌলিক
Fundmentalist	মৌলবাদী
Field worker	মাঠকর্মী
Final report	চূড়ান্ত প্রতিবেদন
Financial year	অর্থ বছর
Fire Service	দমকল বাহিনী

Firm	খামার/বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান
Foreign aid	বৈদেশিক সাহায্য
Freight	মাশুল

G

Gain	লাভ
Global	বৈশ্বিক
Godown	গুদাম
Goods	পণ্য, মাল
Goodwill	সুনাম
Governing body	পরিচালনা পর্ষদ
Grade	পর্যায়
Gratuity	আনুতোষিক
Gravitation	মহাকর্ষ
Guardian	অভিভাবক
Gymnasium	ব্যায়মাগার
Gist	সারমর্ম
Good conduct	শিষ্টাচার
Govt. Security	সরকারি ঋণপত্র
Grant	অনুদান/মঞ্জুরি
Growth	প্রবৃদ্ধি

H

Hand bill	প্রচারপত্র, ইশতেহার
Handicraft	হস্তশিল্প
Handloom	তাঁত
Hangar	বিমানশালা
Harbour	পোতাশ্রয়
Hard money	নগদ টাকা
Hawker	ফেরিওয়ালা
Headline	শিরোনাম
Hearing	শুনানী
Haggling	দর কষাকষি
Hijacker	ছিনতাইকারী
Home Minister	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
Hostage	জিম্মি
Housing	আবাসন
Humidity	আর্দ্রতা
Humanity	মানবতা
House Search	গৃহ তলøাশি
House building advance	গৃহ নির্মাণ ঋণ
Housing and Settlement	গৃহ সংস্থা

I

Ideology	মতাদর্শ
Idiom	বাগধারা
Identification	শনাক্তকরণ
Identified	শনাক্তকৃত
Identity	পরিচয়
Illustration	উদাহরণ, চিত্রণ
Illiterate	নিরক্ষর
Incidental	আনুষঙ্গিক খরচ
Incumbent	পদধারী
Indemnity	ক্ষতিপূরণ
Index	নির্দেশক, নির্ঘণ্ট
Industry	শিল্প
Inefficient	অযোগ্য
Initial	প্রারম্ভিক, অনুস্বাক্ষর
Inquiry	অনুসন্ধান
Insolvent	দেউলিয়া
Inspection	পরিদর্শন
Inspector	পরিদর্শক
Invigilator	পর্যবেক্ষক
Instrument	যন্ত্র
Intellectual	বুদ্ধিজীবী
Instalment	কিস্তি
Institute	সংস্থা, প্রতিষ্ঠান
Instruction	নির্দেশ
Interim	অন্তর্বর্তীকালীন
Internal	আভ্যন্তরীণ
Interpreter	দোভাষী
Interval	বিরাম, বিরতি
Irregular	অনিয়মিত
Interest	সুদ
Immigration	বহির্গমন
Implementation	বাস্তবায়ন
In-charge	ভারপ্রাপ্ত
Incidental	আনুষঙ্গিক
Income tax	আয়কর

Inspector	পরিদর্শক
Inspector-General	মহা-পরিদর্শক
Investment	বিনিয়োগ

J

Jobber	দালাল
Joint Account	যুক্ত হিসাব
Joint Editor	যুগ্ম সম্পাদক
Joint Secretary	যুগ্ম সচিব
Journal	পত্রিকা
Judge	বিচারক
Judgement	রায়
Judiciary	বিচার বিভাগ
Joint collaboration	যৌথ সহযোগিতা
Joint venture	যৌথ উদ্যোগ
Junior	কনিষ্ঠ
Jute goods	পাটজাত দ্রব্য
Jute mill	চটকল

K

Keeper	রক্ষক
Keying	সূত্রানুসন্ধান
Key note	মূলভাব
Kidnapper	অপহরণকারী
Know-how	কৌশল

L

Labour court	শ্রম আদালত
Land Record	ভূমি রেকর্ড/পরচা
Land revenue	জমির খাজনা/খাজনা
Land tax	জমির খাজনা/খাজনা
Landing	অবতরণ
Landlord	জমিদার
Lease	ইজারা
Leave	ছুটি
Lecturer	প্রভাষক
Ledger	খতিয়ান
Leftist	বামপন্থি
Lender	মহাজন
Library	গ্রন্থাগার
Liguistics	ভাষাবিজ্ঞান
Literate	স্বাক্ষর
Lobbying	তদবির
Liabilities	দায়-দায়িত্ব
Livestock	পশুপালন
Look after	দেখাশুনা করা

M

Magistrate	হাকিম
Management	ব্যবস্থাপনা
Manpower employment	জনশক্তি কর্মসংস্থান
Marginal	প্রান্তিক
Manketing	বিপণন
Mass Communication	গণ যোগাযোগ
Magnet	চুম্বক
Mail	ডাক
Maintenance	রক্ষণাবেক্ষণ
Majority	সংখ্যাগুরু
Makeup	রূপসজ্জা
Manuscript	পাণ্ডুলিপি
Martial Court	সামরিক আদালত
Mass educaton	গণশিক্ষা
Mass-media	গণমাধ্যম
Materialism	বস্তুবাদ
Maternity	মাতৃসদন
Manifesto	ইশতেহার
Memo	স্মারক
Memorandum	স্মারকলিপি
Message	বার্তা
Misconduct	দুর্ব্যবহার
Microseope	অণুবীক্ষণ যন্ত্র
Middle class	মধ্যশ্রেণি/মধ্যবিত্ত শ্রেণি
Midwife	ধাত্রী
Mint	টাকশাল
Miscellaneous	বিবিধ
Monsoon	মৌসুমী বায়ু, বর্ষা
Mortgage	বন্ধক
Mortality	মৃত্যুহার
Mutual	পারস্পরিক
Mythology	পুরাণ, পুরাতত্ত্ব

Mercantile Marine	নৌ-বাণিজ্য
Metropolitan Magistrate	মহানগর হাকিম
Metropolitan Police	মহানগর পুলিশ
Minimum Wage	নিম্নতম মজুরি

N

Nominal	নামমাত্র
Note	মন্তব্য
Nutrition	পুষ্টি
Nationality Certificate	জাতীয়তা সনদপত্র
News commentary	সংবাদভাষ্য
Notice	নোটিশ
Notification	প্রজ্ঞাপন
Nuclear	পারমাণবিক

O

Oath	শপথ
Obedient	অনুগত
Observation	পর্যবেক্ষণ
On approval	অনুমোদন সাপেক্ষে
On demand	চাহিবামাত্র
On deputation	প্রেষণে
Optics	আলোক বিজ্ঞান
Optional	ঐচ্ছিক
Orpanage	এতিমখানা, অনাথাশ্রম
Office	দপ্তর
Official	দাপ্তরিক
On duty	কর্তব্যরত
Ordinance	অধ্যাদেশ
Organization	সংগঠন

P

Para	অনুচ্ছেদ
Parade	কুচকাওয়াজ
Parallel	সমান্তরাল
Panel	নামসূচি
Particulars	বিবরণ
Pathology	রোগবিদ্যা
Pen-name	ছদ্মনাম (লেখকের)
Pessimism	দুঃখবাদ
Philology	ভাষাবিদ্যা
Phonetics	ধ্বনিবিজ্ঞান
Pleader	উকিল
Poetics	সাহিত্যতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব
Poster	প্রাচীরপত্র
Post Graduate	স্নাতকোত্তর
Post mortem	ময়নাতদন্ত
Preface	ভূমিকা
Press-note	সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
Project	প্রকল্প
Proposal	প্রস্তাব
Provision	বিধান
Provost	প্রাধ্যক্ষ
Psychology	মনোবিজ্ঞান
Publication	প্রকাশ, প্রকাশনা
Publicity	প্রচার
Public sector	সরকারি খাত
Put up	পেশ করা
Passport	পাসপোর্ট/ছাড়পত্র
Pay Fixation	বেতন নির্ধারণ
Pay increase	বেতন বৃদ্ধি
Permanent	স্থায়ী
Postage	ডাকমাশুল
Prescription	ব্যবস্থাপত্র
Printing	মুদ্রণ
Probation	শিক্ষানবিসী
Promotion	পদোন্নতি
Provisional	সাময়িক
Public Health	জনস্বাস্থ্য
Public holiday	সাধারণ ছুটি

Q

Quack	হাতুড়ে
Quarters	আবাস
Query	জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন
Queue	সারি
Questionnaire	প্রশ্নমালা
Quarterly	ত্রৈমাসিক
Quotation	মূল্যজ্ঞাপন, দরপত্র

Quote	উদ্ধৃত করা
Quoted	উদ্ধৃত

R

Race	জাতি, দৌড়
Radiation	বিকিরণ
Radical	মৌলিক
Radius	ব্যাসার্ধ
Rank	পদমর্যাদা
Rationalism	যুক্তিবাদ
Rating	নির্ধারণ
Realist	বাস্তববাদী
Rebate	বাটা
Recreation	বিনোদন
Renewal	নবায়ন
Republic	প্রজাতন্ত্র
Reprint	পুনর্মুদ্রণ
Requisition	অধিযাচন, তলব
Research	গবেষণা
Reserved	সংরক্ষিত
Retirement	অবসর
Re-union	পুনর্মিলন
Review	পুনর্মূল্যায়ন
Revised	সংশোধিত
Rural	গ্রামীণ
Recruitment	নবনিয়োগ
Regulation	প্রবিধান
Remark	মন্তব্য
Residence	বাসা
Residential	আবাসিক
Revenue	রাজস্ব
Rural Development	পলিø উন্নয়ন
Rural Electrification	পলিø বিদ্যুতায়ন

S

Sale tax	বিক্রয় কর
Safeguard	রক্ষাকবচ
Sample	নমুনা
Sanitation	স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
Satellite	উপগ্রহ
Schedule	তফসিল, তালিকা, সময়সূচি
Screening	বাছাই
Script	লিপি
Sector	খাত
Secular	ধর্ম নিরপেক্ষ
Secularism	ধর্ম নিরপেক্ষতা
Security	জামিন, নিরাপত্তা
Seniority	জ্যেষ্ঠতা
Settlement	নিষ্পত্তি
Session	অধিবেশন
Signature	স্বাক্ষর
Socialism	সমাজতন্ত্র
Solar eclipse	সূর্যগ্রহণ
Sovereign	সার্বভৌম
Specialist	বিশেষজ্ঞ
Specimen	নমুনা
Spokesman	মুখপাত্র
Statement	বিবৃতি, বিবরণ
Statutory	সংবিধিবদ্ধ
Stenotypist	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক
Strike	ধর্মঘট
Study	শিক্ষা
Study Leave	শিক্ষা ছুটি
Subjudice	বিচারাধীন
Submission	পেশ, দাখিল
Sub-rule	উপবিধি
Sub-section	উপ-ধারা
Subsidiary	সম্পূরক
Surgeon	শল্য চিকিৎসক
Surrender	আত্মসমর্পণ
Syllabus	পাঠ্যসূচি, সিলেবাস
Synonymous	সমার্থক
System	পদ্ধতি
Search warrant	তলøাসী পরোয়ানা
Selection Committee	বাছাই কমিটি
Social Service	সমাজ সেবা
Standing Committee	স্থায়ী কমিটি
Steering Committee	পরিচালনা কমিটি
Summary	সার সংক্ষেপ

Supplement	ক্রোড়পত্র
Survey	জরিপ

T

T.A.	ভ্রমণ ভাতা
Take over	কার্যভার গ্রহণ
Taxable	করযোগ্য
Tarriff	মাশুল, শুল্ক
Tenancy	প্রজাস্বত্ব
Tenure	ধারণকাল, মধ্যস্বত্ব
Termination	অবসান
Terminology	পরিভাষা
Terrorist	সন্ত্রাসী
Testimonial	প্রশংসাপত্র
Thesis	গবেষণাপত্র
Tidal bore	জলোচ্ছ্বাস
Tariff	শুল্ক
Technology	প্রযুক্তি
Telegraph	তার
Town Development	শহর উন্নয়ন
Traffic jam	যানজট
Transport	যানবাহন/পরিবহণ

U

Ultimatum	চরমপত্র
Undersigned	নিম্নস্বাক্ষরকারী
Un-employed	বেকার
Unpaid	অপরিশোধিত
Unskilled	অদক্ষ
Up-to-date	হালনাগাদ
Urban	পৌর
Undertaking	অঙ্গীকার
Uniform	উর্দি
Urban Development	নগর উন্নয়ন

V

Vacancy	খালি
Vacation	অবকাশ
Caccination	টিকা, টিকাদান
Vegetarian	নিরীমিষাশী
Valid	বৈধ
Valuation	মূল্য নির্ধারণ
Venue	স্থান
Verbal	মৌখিক
Verification	প্রতিপাদন
Vice-versa	তদ্বিপরীত
Violation	লংঘন
Visitor	সাক্ষাৎপ্রার্থী
Voluntary	স্বেচ্ছাসেবক
Voucher	রসিদ

W

Wages	মজুরি
Waiter	খাদ্য পরিবেশক
War criminal	যুদ্ধাপরাধী
Warrent	পরোয়ানা
Wastage	অপচয়
Weekly	সাপ্তাহিক
White paper	শ্বেতপত্র
Wireless	বেতার
Wit	রসিকতা
Writ	রিট
Water Transport	নৌ পরিবহণ
Wealth	সম্পদ
Weather	আবহাওয়া

X

X-ray	রঞ্জনরশ্মি

Y

Yard	অঙ্গন
Year	বর্ষ
Year Book	বর্ষপঞ্জি
Yearly	বার্ষিক
Yours faithfully	আপনার বিশ্বস্ত

Z

Zodiac	রাশিচক্র
Zonal	আঞ্চলিক
Zonal Office	আঞ্চলিক কার্যালয়
Zone	অঞ্চল
Zoo	চিড়িয়াখানা
Zoology	প্রাণিবিদ্যা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১. আইন সম্পর্কিত দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর বিষয়ক দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।

৩. আপনার জানা যে কোন দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।

৪. নিচের ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা পারিভাষিক শব্দ লিখুন–

Autonomous	Bargaining	Circular	Death rate
Evaluation	Field worker	Humanity	Incidental
Manuscript	Post mortem	Quotation	Remark
Study Leave	Technology		

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. পরিভাষার সংজ্ঞার্থ লিখুন।

২. পারিভাষিক শব্দ কীভাবে চেনা যায়।

৩. পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৪. পরিভাষার প্রয়োগবিধি লিখুন।

৫. বাংলা পরিভাষা রচনার ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।

৬. পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

৭. নিচের ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা পারিভাষিক শব্দ লিখুন–

Arrear
Bankrupt
Civil Court
Demotion
Fiction
Harbour
Interpreter
Lease
Mandate
Oath
Provision
Requisition
Secularism
Surgeon
Tariff
Visitor
Writ
Zonal Office

পাঠ ৮.৬ : অনুবাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- অনুবাদ কী তা বলতে পারবেন।
- অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা কী সে সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- অনুবাদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জ্ঞানবিস্তারে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অনুবাদের সাহায্যেই পৃথিবীর বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা সম্পর্কে সাধারণ পাঠক জ্ঞান লাভ করতে পারে। অনুবাদ হলো কোনো বক্তব্য বা রচনাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা। কোনো রচনার বক্তব্য বিষয়কে পরিবর্তন না করে শুধু ভাষার পরিবর্তনকেই অনুবাদ বলা হয়। কোনো ভাষার সমৃদ্ধি সাধনে ও বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

> **অনুবাদ হলো কোনো বক্তব্য বা রচনাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা। কোনো রচনার বক্তব্য বিষয়কে পরিবর্তন না করে শুধু ভাষার পরিবর্তনকেই অনুবাদ বলা হয়।**

বিশ্বের অগণিত ভাষায় যে বিপুল জ্ঞানচর্চা হচ্ছে, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব এবং মানববিদ্যার যে কোনো বিষয় নিয়ে জ্ঞানের যে প্রবাহ বিকাশ লাভ করছে তা সারাবিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছানোর অন্যতম উপায় হল অনুবাদ। অনুবাদের গুরুত্বের কারণে বিভিন্ন সাহিত্যে অনুবাদ নামক বিশেষ এক শাখা গড়ে উঠেছে। অনুবাদের দ্বারা পরস্পরের ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

অনুবাদের শ্রেণিবিভাগ

অনুবাদ কাজকে দুই ভাগে ভাগকরা যায়। যেমন :

ক) আক্ষরিক অনুবাদ

খ) ভাবানুবাদ

মূল ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে অনুবাদ করা হয় তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা হয়। আক্ষরিক অনুবাদে ভাবার্থের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় না। 'Many men many mind'এই বাক্যের অর্থ যদি করা হয় 'অনেক মানুষ অনেক মন'-- তাহলে তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায়।

মূল ভাষার ভাব ঠিক রেখে সুবিধামত নিজের ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করাকে ভাবানুবাদ বলা হয়। ভাবানুবাদে মূল রচনার প্রতিটি শব্দের অনুবাদ করা হয় না। 'Many men many mind'এই বাক্যের অর্থ যদি করা হয় 'নানা মুনির নানা মত'– তাহলে তাকে ভাবানুবাদ বলা যায়।

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের নমুনা

১. Students have youth and energy. They are filled with high ideals. They are free from the responsibility of maintaining families. So it is easy for them to devote themselves to social service besides their normal duty of acquiring knowledge.
অনুবাদ : **ছাত্রদের আছে যৌবন ও শক্তি। তাদের মন উচ্চাদর্শে পরিপূর্ণ। তারা পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকেও মুক্ত। তাই জ্ঞানার্জনের স্বাভাবিক কর্তব্যের বাইরে তারা সমাজসেবায় নিজেদের সহজে নিয়োজিত করতে পারে।**

২. No man can live alone. When we are children, the family protects us. When we grow up, we need the help of all the people round us. If we try to live alone, our lives are no better than those of animals. Our fathers an mothers, our teachers, our government, our nation, all these train us to do our duty.
অনুবাদ : **কোনো মানুষই একাকী বাস করতে পারে না। আমরা যখন শিশু থাকি, তখন আমাদের পরিজনবর্গ আমাদের প্রতিপালন করেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের আশেপাশের সকলেরই সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হয়।**

৩. Our country is very fertile. On the plains of this country grow crops of various kinds. Paddy and wheat are our staple food. Jute grows abundantly in Bangladesh. Jute is sold to the different countries. So jute is rightly called the `golden fibre'.
অনুবাদ : **আমাদের দেশ অত্যন্ত উর্বর। এদেশের সমতল ভূমিতে বিভিন্ন প্রকার শস্য জন্মে। আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান ও গম। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। পাট বিভিন্ন দেশে বিক্রি করা হয়। পাটকে তাই যথার্থই সোনালি আঁশ বলা হয়।**

৪. A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lesson interesting. She keeps pupils and students awake.
অনুবাদ : **যে কোনো দেশে একজন ভাল শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ লোকদের অন্যতম। বাংলাদেশে ভাল শিক্ষকের প্রয়োজন। একজন ভাল শিক্ষক পাঠদানকে আনন্দদায়ক করে তোলেন। তিনি ছাত্রদের সতর্ক রাখেন।**

৫. Early rising is beneficial to health. The boy who rises early can enjoy the fine air of the morning. He can take a walk by the river side or in the open field. He can enjoy the sweet songs of the birds.
অনুবাদ : **সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। যে বালক সকালে উঠে সে সকালের চমৎকার বাতাস উপভোগ করে। সে নদীর ধারে বা খোলা মাঠে বেড়াতে পারে। সে পাখির মধুর গান শুনতে পারে।**

৬. A newspaper is a storehouse of knowledge.We can know the conditions of other countries from a newspaper. It is, in fact, the summary of all current history. In this scientific age the world without newspaper is unthinkable.
অনুবাদ : **সংবাদপত্র হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার। আমরা সংবাদপত্র থেকে অন্যান্য দেশের অবস্থা জানতে পারি। আসলে এটি সমসাময়িক ইতিহাসের সারকথা। এই বৈজ্ঞানিক যুগে সংবাদপত্র ছাড়া পৃথিবীকে চিন্তা করা যায় না।**

৭. Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment.Those who smoke cannot live long. Smoking causes cancer,heart attack. So everyone should give up smoking.
অনুবাদ : **ধূমপান মারাত্মক ক্ষতিকর। এটি ব্যয়বহুলও বটে। ধূমপান পরিবেশকে দূষিত করে। যারা ধূমপান করে তারা বেশিদিন বাঁচে না। ধূমপান থেকে ক্যান্সার, হৃদরোগ সৃষ্টি হয়। তাই প্রত্যেকেরই ধূমপান ত্যাগ করা উচিত।**

৮. You must have heard the name of Quazi Nazrul Islam. He is a famous poet. His contribution to Bengali literature is incomparable. He is a poet of life and of youth. He is source of our inspiration.
অনুবাদ : **তোমরা অবশ্যই কাজী নজরুল ইসলামের নাম শুনে থাকবে। তিনি একজন বিখ্যাত কবি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান তুলনাহীন। তিনি জীবনের কবি, যৌবনের কবি। তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস।**

৯. We are the inhabitants of an independent country. Freedom is the right of man. But no nation can achieve it without effort. Again, the people of a country must be determined to defend it. It is the sacred duty of every citizen to defend the freedom of the motherland.
অনুবাদ : **আমরা স্বাধীন দেশের বাসিন্দা। স্বাধীনতা মানুষের অধিকার। তবে চেষ্টা ছাড়া কোনো জাতি তা অর্জন করতে পারে না। আবার, দেশের জনগণকে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।**

১০. We live in society. So we must learn to live in peace and amity with others. We have to respect others life and property. We have a lot of duties and responsibilities to the society.
অনুবাদ : **আমরা সমাজে বাস করি। তাই আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, কীভাবে অন্যদের সাথে শান্তিতে ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। অন্যের জান-মালের প্রতিও সম্মান দেখাতে হবে। সমাজের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।**

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। অনুবাদ কী ? অনুবাদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। অনুবাদ কত প্রকার ও কী কী ব্যাখ্যা করুন।

৩। অনুবাদ লিখুন।

ক. Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired throgh all our works from our childhood. Childhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life. æEverything at right time" should be our motto.

খ. Honesty is a noble virtue. It is the secret of success in every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love, respect and fearlesness. An honest man passes his days in respect and happiness. Honesty is the best policy.

গ. Patriotism is love for one's country. It is powerful sentiment and wholly usselfish and noble. A patriot can sacrifice even his own life for the welfare of his country. It is idealism that gives courage and strenght. But false patriotism makes a man narrow-minded and selfish.

ঘ. We are living in an age of science. Science has discovered and invented many things. We use them in our daily life for our comfort and convenience. Electricity is one of the greatest and most important gift of science to man. Electricity has almost changed the mode of our life.

ঙ. The newspaper is a very useful thing. At present we find many newspapers in Bangladesh. Newspaper helps the progress of a nation. People are eager to know what is going on in the world. They can know this and that by reading the newspaper. It gives us all sorts of news of our own land as well as foreign lands.

চ. The necessity of learning English cannot be ever-stated. English is an international language. It is essential in our day-to-day activities. We must know English in order to go in for any job. There is handly any situation where the employees can do without English.

ছ. Bangladesh is not a very big country. But it is one of the most densely populated countries in the world. More than one hundred and four million people live in this small country. Its population is still on the increase. If the present rate of increase continues uncontrolled, her population will be doubled within next twenty years.

জ. A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He keeps pupils and students awake. He also makes them confident and proves them clever. Everybody has something valuable in him. A good teacher discovers the treasure hidden inside each student.

ঝ. Computer is the new miracle of science. It can make thousand of calculations in a moment. It can store in its memory millions of facts and figures. It can also recall them at ease. In our country the use of computer is growing rapidly. Now a day computers are used in banks, shops, airlines, offices, libraries, everywhere. It seems that computer is going to dominate the future civilization of man.

ঞ. It is impossible to describe the beauty of the Taj Mahal in words. It has been called a dream in marble' and 'a tear drop on the forehead of time' but the fairest phrases fail to do justice to the surpassing creation of art. The Taj Mahal is best seen by moonlight when the dazzling white of the marble is mellowed into a dreamy softness. The most charming view, perhaps, is obtained from the palace on the opposite bank of the river.

পাঠ ৮.৭ : অনুচ্ছেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- অনুচ্ছেদ কী তার বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনুচ্ছেদের সংজ্ঞার্থ লিখতে পারবেন।
- অনুচ্ছেদের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন।
- অনুচ্ছেদ রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ইংরেজি paragraph–এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ অনুচ্ছেদ। কম কথায় ও কম লেখায় কোনো বিষয়কে অনুচ্ছেদ আকারে প্রকাশ করা হয়। মূল বক্তব্যকে সহজ-সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করাই অনুচ্ছেদ রচনার উদ্দেশ্য।

অনুচ্ছেদ অর্থ হলো ছোট আকারের গদ্য রচনা। কোনো একটি বিষয়কে শিরোনাম করে সে বিষয়ে মোটামুটি পরিপূর্ণভাবে ছোট আকারের যে রচনা তাকে অনুচ্ছেদ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো একটি বিষয়ের বক্তব্য প্রকাশের জন্য পরস্পর সম্পর্কিত কিছু বাক্যের সমষ্টিকে অনুচ্ছেদ বলা হয়। অল্প সময়ে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করতে হয় বলেই অনুচ্ছেদ আকারে ছোট হয়।

কোন একটি বিষয়কে শিরোনাম করে সে বিষয়ে মোটামুটি পরিপূর্ণভাবে ছোট আকারের যে রচনা তাকে অনুচ্ছেদ বলা হয়।

অনুচ্ছেদের প্রকারভেদ

অনুচ্ছেদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক) বস্তুনিষ্ঠ অনুচ্ছেদ
খ) ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ রচনার প্রয়োজনীয়তা

অনুচ্ছেদে অল্প কথায় পূর্ণাঙ্গ একটি বিষয়কে প্রকাশ করা যায় বলে একে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বলে মনে করা হয়। বক্তব্যকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে উপস্থাপনের জন্য অনুচ্ছেদ রচনার বাস্তব ধারণা থাকা প্রয়োজন। অনুচ্ছেদে মূল কথাগুলোকে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয় বলে সবার কাছে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়।

অনুচ্ছেদ রচনার নিয়ম

- সহজ-সরল ও ছোট আকারে বক্তব্য প্রকাশই অনুচ্ছেদ রচনার মূল প্রতিপাদ্য।
- অনুচ্ছেদ একটি প্যারাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।
- শুরুতে শিরোনাম দিয়ে একটি প্যারার মধ্যে সূচনা, মূল বক্তব্য ও মন্তব্যকে উপস্থাপন করতে হবে।
- অনুচ্ছেদে উপমা-অলংকারের ব্যবহার না করাই সমীচীন।
- সাধু ও চলতি ভাষা একসঙ্গে প্রয়োগ করা যাবে না।
- অনুচ্ছেদ আকারে ছোট হলেও বক্তব্য হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কতিপয় অনুচ্ছেদ রচনার নমুনা

বাংলাদেশের উৎসব

বৈচিত্র্যময় দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। উৎসবে-উপলক্ষ্যে-আয়োজনে বাংলাদেশ প্রায় সারা বছরই মুখর থাকে। বিভিন্ন উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। এদেশের শত দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ উৎসবমুখী। এই উৎসবগুলোর মধ্যে রয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পারিবারিক–ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব। বাংলাদেশ একটি উদার সহিষ্ণু দেশ। জাতীয় নানা উৎসবের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যায়। নববর্ষের উৎসব বাংলাদেশের সব মানুষের উৎসব। এটি একটি সর্বজনীন ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব। বর্ণ–ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ বাঙালি হিসেবে নিজের পরিচয় তুলে ধরে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক শাশ্বত পরিচয়টি ফুটে ওঠে। সামাজিক উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষের সমাজবন্ধন-সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পারিবারিক উৎসব ও সামাজিক উৎসবের মধ্যে মূলত তেমন পার্থক্য করা যায় না। পারিবারিক উৎসবগুলোও সামাজিক উৎসবের নামান্তর। বিবাহ-জন্মদিন প্রভৃতি উৎসবগুলো পারিবারিক গণ্ডি ছাপিয়ে সামাজিক উৎসবের রূপ লাভ করে। কৃষিভিত্তিক নবান্ন উৎসবটিও একইসঙ্গে পারিবারিক ও সামজিক উৎসব হয়ে ওঠে। নবান্নতে আত্মীয়স্বজন ছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাংলাদেশে ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে রয়েছে ইদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা। মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ নিজ রীতি মেনে এইসব উৎসব পালন করে থাকে। উৎসব বাঙালির প্রাণ, বাঙালির আনন্দ। ধর্মীয় উৎসবগুলোও এখন সামাজিক রূপ নিয়েছে। বছরব্যাপী উৎসব হওয়াতে আমাদের অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্যেও এর দারুণ সুফল লক্ষ করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, ভালো বেচাকেনা হয়, মানুষের জীবনে সচ্ছলতা দেখা দেয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে ঘিরেই মানুষের আবেগ প্রকাশ পায়। বাঙালির এই আবেগ ও মমতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১শে ফ্রেব্রুয়ারিতে। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এইদিনে বাঙালি সন্তানেরা প্রাণ বিসর্জন দেয়। এই দিনটিই সারা বিশ্বে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এর সদরদপ্তর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য ১৮৮টি দেশে এই দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হচ্ছে। বাংলার গৌরব ও অহংকার আজ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। প্রথম দিকে ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদদিবস হিসেবে পালিত হতো, তারপর পালিত হয় ভাষাদিবস হিসেবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। সব ভাষাই মূল্যবান, সব ভাষাই মানুষের ঐতিহ্য– এই চেতনার বিকাশ ঘটেছে মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থেকে। মূলত নিজ নিজ মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাই হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য।

বর্ষণমুখর দিন

আষাঢ়ের পথ ধরেই আসে বর্ষা। শ্রাবণে বর্ষা পায় পূর্ণ রূপ। সকাল থেকেই কালো মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। শ্রাবণের এই দিনে মেঘ-বৃষ্টির খেলা। গ্রীষ্মের দাবদাহে বর্ষা নিয়ে আসে স্বস্তির পরশ। বড় খেয়ালি এই বর্ষার দিন। কখনো অতিবর্ষণ, কখনো অল্পবর্ষণ, কখনো বা প্লাবন বা বন্যা। বর্ষণমুখর দিনে হঠাৎ অন্ধকার করে আসে, কখনো বা শুরু হয় বিজলির চমকানি। সবুজ শ্যামল গাছেরা ভিজতে থাকে অঝোর ধারায়। সমস্ত পশুপাখি নীড়ে আশ্রয় নেয়, মানুষও ঘরে থেকে উপভোগ করে বর্ষার সৌন্দর্য। দিনের বেলাতেও নিবিড় অন্ধকার চারপাশ আবৃত করে রাখে। একটানা বৃষ্টিতে ধান-পাট ক্ষেতের উপর দিয়ে বয়ে যায় বাতাসের ঢেউ। ডোবা-নালা থেকে ব্যাঙের ডাক, ঘরে দীর্ঘ কর্মহীন দিন। অঝোর ধারাবর্ষণ এই সময়ে মানুষের মনকে উদাস করে তোলে। বর্ষা মানবমনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। মানবমন হয়ে ওঠে চঞ্চল, পাওয়া-না-পাওয়ার বেদনা জেগে ওঠে মানুষের মনের কোণে। কবিহৃদয়ে বর্ষার আবেদন গভীর। কবি কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু কবি বর্ষা নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। বর্ষা ও বিরহ নিয়ে লেখা হয়েছে কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য 'মেঘদূতম্', মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি রচনা করেছেন বর্ষাবিরহের পদ, গোবিন্দদাস রচনা করেছেন বর্ষাভিসার

বিষয়ক পদাবলি। তবে একটানা বর্ষণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে সংকট ডেকে আনে। যারা কায়িক শ্রমের বিনিময়ে দিন এনে দিন খায় তাদের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এই সময়ে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ২৪ বছরের শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে বাঙালি জাতি তার কষ্টার্জিত মুক্তি লাভ করে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির গৌরব, আমাদের অহংকার। মুক্তিযদ্ধের ইতিহাসকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে সেই ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এটি বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ। ঢাকার সেগুনবাগিচা এলাকায় এই জাদুঘরের অবস্থান। কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তির উদ্যোগে নিরপেক্ষভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য এটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রবেশপথের মুখেই রয়েছে 'শিখা চির অম্লান'। এই জাদুঘরটি দ্বিতলা ছিল। গত ১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নয় তলাবিশিষ্ট নতুন ভবনে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরটি স্থানান্তর করা হয় এবং পরের দিন ১৬ এপ্রিল 'শিখা চির অম্লান' প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রায় দুই বিঘা জায়গাজুড়ে নির্মিত ভবনের ব্যবহারযোগ্য আয়তন ১ লক্ষ ৮৫ হাজার বর্গফুট। মুক্তিযুদ্ধের নানা তথ্য, প্রমাণ, দলিল, ছবি, নিদর্শন, রেকর্ডপত্র, স্মারকচিত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের সুব্যবস্থা রয়েছে এই জাদুঘরে। বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতির হাজার বছরের ধারবাহিকতা সংরক্ষিত হয়েছে এখানে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে এই প্রজন্মের তরুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়াই এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য। এই জাদুঘর প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে যা আমাদের এই মহান ইতিহাসের চেতনাকে বিকশিত করে তুলবে দিন দিন। তবে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব বাড়াতে এই জাদুঘরকে কেবল সংগ্রহশালা ও প্রদর্শনশালা হিসেবে ব্যবহার করলে চলবে না। সবধরনের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একে আরও উন্নত করে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত পোশাক শিল্প। 'পোশাককন্যা' নামটি পোশাকশিল্পের কারণেই আজ এত বিখ্যাত। কারণ বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে সবচাইতে বেশি শ্রম দেয় নারীরাই। বাংলাদেশের শিল্পায়নে এই তৈরি পোশাকশিল্প বর্তমানে বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শিল্পায়ন শুরু হয়েছে শিল্প বা পোশাকশিল্পের মাধ্যমে। তৈরি পোশাক বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান খাত হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। স্বাধীনতার আগে আমরা যখন পশ্চিম পাকস্তানিদের অধীনে ছিলাম তখন পোশাকশিল্প নিয়ে তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল না। মূলত ১৯৭৬ সাল থেকেই এদেশে পোশাকশিল্পের যাত্রা শুরু হয়। দেশের তৈরি পোশাকশিল্প জাতীয় আয়ের ৬৪ শতাংশ সরবরাহ করছে। বর্তমানে প্রায় ১২ লক্ষ নরনারী পোশাকশিল্পে কর্মরত। তার মধ্যে ৮৫ শতাংশ নারী। আমাদের পোশাক বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের স্থান পঞ্চম। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের সবচেয়ে বড় ক্রেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারপরেই ইউরোপ ও কানাডা। বিশ্বের ১২২টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি করা হয়। এর বাজার যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি এর উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বেকার সমস্যা সমাধান, দ্রুত শিল্পায়নে পোশাকশিল্পের ভূমিকা বিরাট। কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও মুক্ত বাজারের চাপ এ শিল্পকে বেশ খানিকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখেছে। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও সম্প্রসারণ করা দরকার। বর্তমান সরকার এই শিল্পের বিকাশে নানারকম সুবিধা ও উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছেন। বাণিজ্য মেলার আয়োজন করছেন এবং বাংলাদেশকে এশিয়ান হাইওয়েতে যুক্ত করাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

ইন্টারনেট

একুশ শতক বিজ্ঞানের চরম উন্নতির শতক। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। ইন্টারনেট তার দৃষ্টান্ত। বর্তমান যুগ হলো তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। ইন্টারনেট একটি বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনী সর্বপ্রথম ইন্টারনেট ব্যবহার করে। সফটওয়ার এর মূল উপকরণ। বর্তমানে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই

যেখানে ইন্টারনেটের ছোঁয়া লাগেনি। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিয়েছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজেই ই-মেইল পাঠিয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্রিকা, ম্যাগাজিন পড়া যায়। লাইব্রেরিতে লেখাপড়া করা যায়, ক্যাটালগ দেখে ইচ্ছেমত বই বাছাই করা যায়। প্রয়োজনীয় তথ্য প্রিন্টও করা যায়। ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপন দেখে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ইন্টারনেটে দেশে-বিদেশের ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ইন্টারনেটে ফেসবুক ও টুইটারের মাধ্যমে সমস্ত রকম সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। ইন্টারনেটের বিরাট সুফলের পাশাপাশি কিছু কুফলও রয়েছে। ইন্টারনেট আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর সৃষ্টি। এর বহুমুখী ব্যবহার মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

ছিটমহল বিনিময়

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ছিটমহল বিনিময় একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ছিটমহল হলো একটি রাষ্ট্রের ভেতর অন্য রাষ্ট্রের কোনো ভূখণ্ড থাকা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হবার সময় এই ছিটমহলের উৎপত্তি হয়। রেডক্লিফের তৈরি মানচিত্রের কারণে এই ছিটমহল সংকটের সৃষ্টি হয়। বিতর্কিত বিভাজনের ফলে এক দেশের ভূখণ্ডে থেকে যায় অন্য দেশের অংশ। ২০১৫ সাল পর্যন্ত ভারতের ১১১টি ছিটমহল ছিল বাংলাদেশের ভেতরে এবং বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ছিল ভারতের ভূখণ্ডে। ছিটমহলের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫১ হাজার। দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভারতের অধিকাংশ ছিটমহল অবস্থিত। লালমনিরহাটে ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়িগ্রামে ১২টি ও নীলফামারিতে ৪টি ছিটমহল ছিল ভারতের। বাংলাদেশের ছিটমহলগুলির মধ্যে ৪৭টি কুচবিহার জেলায় এবং ৪টি জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত ছিল। দীর্ঘ ৬৮ বছর ধরে ছিটমহল সমস্যা এক গভীর মানবিক সংকটের সৃষ্টি করে রেখেছিল। কোনোরকম বাছবিচার না করে হুট করে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা ভাগ করায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির পর ছিটমহলগুলোর তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়। তালিকায় গড়মিল দেখা দেয়ায় আবারো তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে ২০১৫ সালের ০১ আগস্ট রাত ১২:০১ মিনিটে দুই দেশ মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির আওতায় ছিটমহলগুলো একে অপরের কাছে ফেরত দেয়। কুড়িগ্রামের দাসিয়ার ছড়া এই সময়ে মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পায়। ৬৮ বছরের পরাধীন জীবন থেকে ছিটমহলের মানুষেরা মুক্তি পায়। তারা নিজেদের পরিচয় ও ঠিকানা খুঁজে পায় এই ছিটমহল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে।

পর্যটনশিল্প

বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব শিল্প বিকাশ লাভ করেছে পর্যটনশিল্প তাদের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যটনশিল্প বেড়েই চলেছে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই শিল্পকে ঘিরে মানুষের নানারকম কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বহু আগে থেকেই এদেশে অনেক বিখ্যাত লোক ভ্রমণে এসেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পর্যটনশিল্পে প্রচুর বিনিয়োগ করছে। বছরে বাংলাদেশে পর্যটকের সংখ্যা দেড় লাখের মতো। কিন্তু ভারত, নেপাল ও মালদ্বীপের তুলনায় এই সংখ্যা অনেক কম। অথচ আমাদের রয়েছে অপরূপ সুন্দর ভূ–প্রকৃতি, রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। বিস্তৃত সমুদ্র উপকূল ছাড়াও সুন্দরবনের মোহনীয় রূপ পর্যটনশিল্পে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। দক্ষিণে পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির মনোরম প্রকৃতি, পাহাড়-পর্বত, জলপ্রপাত, সিলেট-শ্রীমঙ্গলের চোখ জুড়ানো চা-বাগান, পাহাড়পুর-ময়নামতি-লালবাগের ঐতিহাসিক নিদর্শন আমাদের মূল্যবান পর্যটন-সম্পদ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই শিল্প ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। এর জন্য দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের রয়েছে গুরুদায়িত্ব। পর্যটনশিল্পের বিকাশে সরকার বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করলেও তা আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি। বাংলাদেশ ভ্রমণে বিদেশিদের আগ্রহ থাকলেও ভিসাসহ নানা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অনেকেই এদেশে আসতে অনীহা বোধ করে। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদী হামলার কারণেও সাময়িকভাবে পর্যটনশিল্পে একধরনের স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশের চমৎকার প্রকৃতি, ভূ-দৃশ্য, সমুদ্রতট, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, দিগন্তবিস্তৃত সুন্দরবন, ঋতুবৈচিত্র্য এবং এদেশের মানুষের সহজ সরল ব্যবহার ও আতিথেয়তা আমাদের পর্যটনশিল্পের বিকাশে অনুপম উৎস হতে পারে।

নারীশিক্ষা

জাতীয় উন্নয়নে নারীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ নারীরাও দেশের মানবসম্পদ। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতিতে এখন নারীদের জয়জয়কার। গুহাবাসী আদিম সমাজে নরনারীদের যৌথ চেষ্টার ফলেই গড়ে উঠেছে আজকের সভ্যতা। সামন্ত যুগে ধর্ম ও নৈতিক অনুশাসনের মাধ্যমে নারীদের ঘরে বন্দি করে রাখা হতো। শিক্ষা দূরে থাক, নারীদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না। ভোগের পণ্য হিসেবে মনে করা হতো তাদের। কিন্তু সেই সময় পেছনে ফেলে নারীদের বিজয়গাথা এখন চারদিকে শোনা যাচ্ছে। মেধায়, দক্ষতায়, কর্মে ও শিক্ষায় নারীরা আজ বিশ্বকে জয় করেছে। ইউরোপের মতো উন্নত বিশ্বে নারীরা শিক্ষা-সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক স্থান দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশে নারীশিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ওই সব স্থানে যেন প্রাচীন অন্ধকার ফিরে এসেছে। ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারীদের কেবল যৌনদাসী বানানোর চেষ্টা চলছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে সবার মতো নারীদের জন্যও শিক্ষাকে কেবল বাধ্যতামূলক করা হয়নি, বরং তাদের নানারকম সুযোগসুবিধাও দেয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তার সুযোগ সীমিত। পথশিশুরা অনেকেই এখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। বাল্যবিবাহের কারণে অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, ফলে শিক্ষাগ্রহণ আর হয় না। ইভ টিজিং ও এসিড সন্ত্রাসের ভয়ে অনেক মা-বাবা মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চায় না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, সংসদের স্পিকার প্রত্যেকেই নারী, পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসক, নারী উদ্যোক্তাসহ বিমানচালক এবং বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে নারীরা যোগ্যতার সঙ্গে অধিষ্ঠিত হলেও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক উন্নতি করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে শুধু সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে সমাজের সকলকেই নারীশিক্ষার বিস্তারে এগিয়ে আসতে হবে।

মিতব্যয়িতা

জীবনকে সুন্দরভাবে যাপন করার জন্য মিতব্যয়িতার প্রয়োজন অপরিসীম। পরিমিত ব্যয় করার অভ্যাসের নাম মিতব্যয়িতা। এটি মানুষের জীবনের একটি প্রধান গুণ। জীবনের সবক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার দরকার পড়ে। কথায়, আচরণে, আয়-ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রয়োজন সর্বাধিক। আয় বুঝে ব্যয় না করলে তার কপালে দুঃখ অনিবার্য। আয় বেশি হলেও দরকারের চেয়ে বেশি খরচ করাটা অপচয়মাত্র। মিতব্যয়ী মানুষ জীবনে কখনো সংকটে পড়ে না। মিতব্যয়ী হলে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা যায়। এই সঞ্চিত অর্থ দুর্দিনে অনেক কাজে লাগে। কেবল নিজের কাজে নয়, সঞ্চিত অর্থ অন্যের বিপদেও উপকারে লাগে। মিতব্যয়ী না হলে মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দিনের আলোতে যদি কেউ শখ করে মোমের বাতি জ্বালিয়ে অহেতুক অপচয় করে তবে এমন একদিন আসবে যখন রাতের অন্ধকারেও তার ঘরে আলো জ্বলবে না। জীবনকে গুছিয়ে যাপন করার জন্যই মানুষ অর্থ আয় করে কিন্তু সেই অর্থ অযথা উলøাসে, অসংযত বিলাসে ব্যয় করলে তার পরিণতি ভালো হয় না। মিতব্যয়িতা কেবল ব্যক্তিজীবনে নয়, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিকভাবেও মানুষের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মিতব্যয়ী হতে হবে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সংযমী না হলে দেশের কল্যাণ ও জবাবদিহিতা হুমকির মুখে পড়ে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের সবার সম্পদ। তাই রাষ্ট্রের কল্যাণে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে অর্থ অপচয় না হয় বা বাজে কাজে বিপুল পরিমাণ টাকা নষ্ট না হয়। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু জনসংখ্যা অধিক। ফলে সব সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উদ্যোগ হতে হবে জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নবান্ধব। অপ্রয়োজনে বেশি কথা বলাও স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বাকসংযম ব্যক্তির দায়িত্ব ও ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। মিতব্যয়ী হলে জীবন সহজ ও কল্যাণময় হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। অনুচ্ছেদ বলতে কী বোঝায় ? অনুচ্ছেদের সংজ্ঞার্থ আলোচনা করুন।

২। অনুচ্ছেদ রচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে অনুচ্ছেদ রচনা করুন :

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মাদকাসক্তি, বই পড়ার আনন্দ, জনসংখ্যা সমস্যা, সুন্দরবন

পাঠ ৮.৮ : দিনলিপি লিখন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- দিনলিপি কী তা বলতে পারবেন।
- দিনলিপি লিখনের শর্তগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানুষ তার প্রতিদিনের ঘটনাগুলো যখন লিপিবদ্ধ করে রাখে তখন সেটিকেই দিনলিপি বলা হয়। সুখ-দুঃখ, ঘটনা-দুর্ঘটনা, আবেগ-অনভূতি নিয়েই মানুষের জীবন। জীবনের প্রতিদিনের এই অভিজ্ঞতাকে মানুষ স্মৃতির মতো ধরে রাখতে চায়। নানাজন নানাভাবে এই অভিজ্ঞতা অক্ষয় করে রাখতে চেষ্টা করে। কেউ লিখে কবিতা, কেউ গল্প, উপন্যাস– কেউবা গানের কথার মধ্য দিয়ে নিজের বিচিত্র কথাকে সাজিয়ে রাখে। দিনলিপি রচনার ব্যাপারটিও সেরকম। নিজের জীবনে প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখে রাখলেই দিনলিপি রচিত হয়।

দিনলিপি হচ্ছে তাই, যেখানে মানুষ তার প্রতিদিনের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখে।

দিনলিপি লিখনের শর্তসমূহ

দিনলিপি লিখনে কিছু শর্ত মেনে চলতে হয়–

১। নির্দিষ্ট দিনের তারিখ উলেøখ করতে হবে।
২। দিনলিপিতে সময় ও স্থানের উলেøখ করতে হবে।
৩। দিনের প্রধান উলেøখযোগ্য ঘটনাগুলোর বিবরণ সংক্ষেপে লিখতে হবে।
৪। ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় উলেøখ করতে হবে।
৫। ব্যক্তিগত অভিমত বা বিশেøষণ থাকতে পারে।

নির্বাচনি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনের দিনলিপি

ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১৬

গ্রাম থেকে আমার সেই প্রথম শহরে আসা। প্রথম এই ধরনের বড় নির্বাচনি পরীক্ষায় বসা। খুব ভালো করার আশা তো ছিল দুরাশামাত্র, ভীষণ দুঃশ্চিন্তায় পরীক্ষা শেষ করেছিলাম। অবশেষে ফল প্রকাশের দিন চলে আসল। কিছুতেই মনের শঙ্কা কাটছিল না। নতুন শহরে বন্ধুবান্ধবও তেমন ছিল না। যতই ফল ঘোষণার সময় ঘনিয়ে আসছিল, হৃদকম্পনও ততই বেড়ে চলল। টান টান উত্তেজনার মধ্যে সবাই অপেক্ষা করছিল। সব আনুষ্ঠানিকতা অবশেষে শেষ হলো। বিকেল চারটার দিকে ঘোষণা করা হলো ফল। বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে শুনলাম আমি প্রথম হয়েছি। আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

মুহূর্তেই সব কিছু যেন বদলে গেল আমার। কয়েকজন ছুটে এসে আমাকে অভিনন্দন জানালো। আমার দু-একজন আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তারা ফল শুনেই বাড়িতে আমার মা-বাবাকে ফোনে জানিয়ে দেয়। আমি বাড়িতে খবরটি জানানোর আগেই তারা ফোন দিয়ে তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এবং শহরে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা হয়। প্রথম হওয়ায় আমাকে পুরস্কার হিসেবে বেশকিছু বই ও একটি সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর দেয়া হয়।

মা-বাবা আমাকে দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেই কান্না শুরু করে দেন। আমিও আবেগ সামলাতে পারিনি, শুরু হয় আমারও কান্না। খুশি হয়ে বাবাও আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দিতে চান। একটি পরীক্ষায় ভালো করে এত পুরস্কার পেয়ে আমার আনন্দ দেখে কে ?

বিজয় দিবসের দিনলিপি

১৬ ডিসেম্বর ২০১৬

বছরের এই দিনটি অন্যরকম আনন্দের, উচ্ছ্বাসের এবং মুক্তির। বিজয় দিবস আজ। বিজয় দিবসের এই দিনটি অসাধারণ কাটল। আমাদের ইতিহাসের ঘটনাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত এক মিল রয়েছে। ৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলন, ২৬শে মার্চ ৭১-এ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু এবং তারই পথ ধরে ১৬ ডিসেম্বর ৭১–এ পেলাম বিজয়। বিজয়ের মহাআনন্দের মধ্য দিয়ে বছরটি শেষ হয়। প্রতিবছর দিনটি আনন্দ-উৎসবে পালিত হলেও এবার আমার ক্ষেত্রে বিজয় দিবসটি নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এ বছর কলেজে পা রেখেছি আমি। বিপুল সমারোহের সঙ্গে কলেজেই উদ্‌যাপন করা হলো দিবসটি।

খুব ভোরে চলে আসলাম কলেজে। রাঙা সূর্যের প্রথম আলো দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অধ্যক্ষ স্যারের সঙ্গে শত শত ছাত্রছাত্রী রঙবেরঙের পোশাকে জাতীয় সংগীত গাইল। কলেজে যেন রঙের উৎসব। ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো। বিজয় দিবসের কথা নানাজনের বক্তব্যে উচ্চারিত হলো, আলোচনায় উঠে এলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নাম। গান, কবিতা, দলীয় নাচ, স্মৃতিচারণ, অভিনয়, কৌতুক সবকিছুই ছিল অনুষ্ঠানে। বিজয় দিবসের রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কারও দেয়া হলো। ৩য় পর্বে দেখানো হলো মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র 'যুদ্ধজয়ের গান'। এর পাশাপাশি ছিল সারাদিনব্যাপী রক্তদান ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। একাত্তর আমি দেখিনি কিন্তু আজকের এই দিনে বুঝতে পেরেছি স্বাধীনতার মূল্য। বুঝতে পেরেছি কত রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই দেশ।

তোমার প্রিয় শিক্ষকের বিদায় দিনের দিনলিপি

১ জানুয়ারি, ২০১৭

প্রত্যেকের জীবনেই কোনো একটি দিন আসে যেদিনের কথা মনে হলে বেদনা ও বিষণ্নতার স্মৃতি জেগে ওঠে। ১ জানুয়ারি দিনটি আমার জীবনে তেমনি একটি দিন। সব থেকে কাছের, সব থেকে প্রিয় মানুষটিকে আজ হারিয়েছি আমি। আমার ভালোলাগার শিক্ষক অশোক স্যারের কথা বলছি। অশোকতরুর মতোই আমার জীবনে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়েছিলেন স্যার। ধনী ঘরের সন্তান ছিলেন বলেই শুনেছি, শখের বশে এসেছিলেন শিক্ষকতা করতে– স্যার বলতেন 'মাস্টারি'। একাত্তরে যুদ্ধ করেছেন দেশের জন্য। কারো বাধা মানেননি। স্কুলের উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বড় চাকরির লোভ ত্যাগ করে চলে গেছেন লড়াইয়ের মাঠে। গ্রামে জমিদারের ছেলে বলেই সবাই ডাকত। জমি-জমা, খেতি-খোলা ছিল অজস্র। সেজন্যই বোধ হয় 'জমিদার' সম্বোধন। ব্রিটিশ আমলে সত্যিকারের জমিদারি ছিল তাঁদের। এখন জমিদারি নেই, কিন্তু নামটি আছে। গ্রাম থেকে প্রথম যেদিন শহরের কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম সেদিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। শহুরে ছেলেদের মতো চটপটে নই আমি, পোশাক-আশাকও সাধারণ মানের। ফর্সা তক্‌তকে টাকাওয়ালা ছেলেদের দেখে বুক কাঁপতো। অন্য কেউ নয়, কোনো সহপাঠি বন্ধু নয়– আমার প্রিয় অশোক স্যারই সেদিন ধরতে পেরেছিলেন আমার এই অসহায়ত্বটা। হাতের ইশারায় কাছে ডেকে নিয়েই জিজ্ঞাসা করেন কোত্থেকে এসেছি। গ্রামের নাম শুনে বললেন চিন্তার কারণ নেই আমিও গ্রামেরই মানুষ। এক মুহূর্তেই ভরসার একটি জায়গা পেয়ে গেলাম। সেই ভরসা পরিণত হলো পরম মমতা, শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসায়। ক্লাশে খুব প্রাণবন্ত ছিলেন স্যার। সাহিত্যটা ভালো জানা ছিল তাঁর। তার চেয়ে বেশি জানতেন জীবনের গল্প। কতো গল্পের ভাণ্ডার যে তাঁর মধ্যে ছিল তার হিসেব নেই। দেখতে দেখতে দুটি বছর কেটে গেল। একদিন কলেজে গিয়েই শুনলাম আমাদের সবার প্রিয় অশোক স্যার বদলি হয়ে চলে যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। যশোরে পৈত্রিক বাড়ি স্যারের। সেখানেই নামকরা একটি কলেজে বদলি হয়েছেন স্যার। চাকরি জীবনের শেষ দিনগুলো বাড়ির কাছেই কাটাতে চান তিনি।

বিদায় অনুষ্ঠানে ছিল এক গভীর বিষণ্নতা। অধ্যক্ষ মহোদয় অশোক স্যারের অনেক প্রশংসা করলেন। প্রশংসা করলেন তাঁর প্রজ্ঞার। কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন সে কথাই বারবার আসলো সবার কথায়। অশোক স্যার যাবার আগে আমাকে কিছু বই উপহার দিয়ে গেছেন। সেগুলো পড়ার টেবিলে রেখেছি। বইগুলো দেখলেই স্যারের কথা মনে পড়ছে।

হাসপাতালে বন্ধুর অসুস্থ পিতার শয্যাপাশে রাত কাটানোর দিনলিপি

২ মার্চ ২০১৭

খবরটা হঠাৎ করেই পেলাম। প্রিয় বন্ধু নাজমুলের বাবা হাসপাতালে। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা বোধ করায় তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়া হয়েছে তাঁকে। ওখান থেকেই ফোন করেছে ও। নাজমুল আমার এত কাছের যে, ও ডাকলেই আমাকে ছুটে আসতে হয়। স্কুল জীবন থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। একই গ্রাম, একই স্কুল। কলেজ ছুটি থাকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম ধরলা নদীর পাড়ে। প্রায় প্রতিদিন বিকালে এখানে আসি। নাজমুলের ফোন পেয়েই দে ছুট। হাসপাতালে গিয়ে যখন পৌঁছালাম দেখি একজন ডাক্তার নাজমুলের বাবাকে পরীক্ষা করছেন। সকালেই ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কতক্ষণ কথা বললাম ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে। ভাবতেই পারছি না যে, এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বেন উনি। ডাক্তার সবকিছু দেখে ইসিজি করার জন্য বললেন। সন্ধ্যার পর ইসিজি রিপোর্ট পাওয়া গেল। হার্টে সামান্য সমস্যা। দুতিন দিন থাকতে হবে হাসপাতালে। খবর পেয়ে নাজমুলের আত্মীয়-স্বজনরা আসতে শুরু করলো হাসপাতালে। ওর বড় বোন, খালা এবং খালু চলে আসলেন কিছুক্ষণের মধ্যে। নাজমুল বলল ভয়ের কিছু নেই। সামান্য ওষুধেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। ওর বোন, খালা হাসপাতালে এসেই কান্না শুরু করলেন। নাজমুলের কথা শুনে কিছুটা স্বস্তি পেলেন এবং ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার জন্য অন্য ওয়ার্ডে গেলেন। রাতে হাসপাতালে থেকে যাবার জন্য নাজমুল আমাকে অনুরোধ করলো। আমি সাগ্রহে রাজি হলাম। নিজের বাবা হলে তো আমি হাসপাতালেই থাকতাম। সে রাতের কথা আজও মনে পড়ে। আমরা দুই বন্ধু সারারাত দুচোখের পাতা এক করিনি। গল্পের পর গল্প। এমন কোনো কথা নেই যা আমরা বলা বাকি রেখেছি। আমাদের ব্যক্তিগত-পারিবারিক কথা থেকে শুরু করে চারপাশের সামাজিক পরিস্থিতি সবই আমরা বলাবলি করেছি। প্রথমে ঠিক করেছিলাম একজন ঘুমাবো, অন্যজন জেগে থাকবো। এভাবে চলবে পালাক্রমে। কিন্তু একবার গল্প জমে ওঠার পর ঘুম পালালো। অনেক রাতে ডিউটির ডাক্তারটি রোগীকে দেখে খুশি হলেন। আমাদের টেনশনও বেশ কমে গেল। কিছুক্ষণের জন্য নাজমুলের একটু ঝিমুনি এসেছিলো। আমি ওকে জাগাইনি। ভোরের আজানের সময় ওর ঘুম ভাঙল। খুব লজ্জা পেল আমাকে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলে। পরদিন এই আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম যে, নাজমুলের বাবা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তোমার কলেজে নজরুল জয়ন্তী উদযাপনের দিনলিপি

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, রোববার
সকাল ১০টা

বাঙালির প্রাণের কবি নজরুল। আমাদের সংগ্রামী চেতনার কবি নজরুল। বিদ্রোহী কবি নজরুল আমার প্রিয় কবি। আজ কলেজে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মদিন উদযাপন করা হলো। কয়েকদিন থেকেই নানা প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। বেশ সকালেই হাজির হলাম কলেজে। মঞ্চটি চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছিল। প্রখ্যাত একজন শিল্পীর আঁকা একটি ছবি মঞ্চের পেছনে রাখা হয়েছিল। নজরুলের সেই বিখ্যাত বাবরি চুলের বিদ্রোহী চেহারার ছবিটি দেখে প্রাণ ভরে গেল।

সকাল ১০টার মধ্যে অডিটরিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ। তিন ভাগে বিভক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল উদ্বোধনী ও আলোচনা সভা। কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত নজরুল গবেষক ড. রফিকুল ইসলাম।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে কয়েকজন আলোচনায় অংশ নেন। আমাদের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দও চমৎকার আলোচনা করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উঠে আসে কবি নজরুলের নানা দিক। নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি মমত্ব, মানবতার জন্য তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর কথা শুনে আমরা আলোড়িত হই। গোঁড়া মুসলিম ও গোঁড়া হিন্দু উভয়ের দ্বারাই আক্রান্ত হন কবি। প্রেম ও বিদ্রোহের এমন যুগল মিলন বাংলা সাহিত্যে খুব কমই ঘটেছে বলে মত দেন শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ জনাব হামিদুর রহমান নজরুলের চেতনাকে জীবনে ধারণ ও লালন করার ওপর জোর দেন। নজরুলের সাহিত্য বেশি করে পড়ার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া নজরুলের সাহিত্য নিয়ে আরও গবেষণা হওয়া উচিত বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

দ্বিতীয় পর্বে আবৃত্তি অনুষ্ঠান। কলেজের বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী কমল ও ফারিয়া নজরুলের একাধিক কবিতা আবৃত্তি করে সবাইকে মাতিয়ে তোলে। এক পর্যায়ে অধ্যক্ষ স্যার নিজেই নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করে শোনান। সবাই খুব উপভোগ করি স্যারের এই আবৃত্তি।

তৃতীয় পর্বে সংগীতানুষ্ঠান। বিখ্যাত 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানটি দিয়ে এই পর্বের যাত্রা শুরু। কলেজের অনেক তরুণ শিক্ষার্থী গান গেয়ে মুগ্ধ করে শ্রোতাদের। সবশেষে মঞ্চে আসেন শিল্পী কমলকলি। তিনি মঞ্চে ওঠার সাথে সাথেই প্রচণ্ড করতালিতে ফেটে পড়ে অডিটরিয়াম। প্রেম ও বিদ্রোহের বেশ কটি গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন এই শিল্পী। 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব', 'শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল' প্রভৃতি গান এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিন ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করলাম। অনেক আনন্দ আর একরাশ স্মৃতি নিয়ে ফিরলাম ঘরে।

বইমেলা দেখার অনুভূতি

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মফস্বল শহরে থাকি। বহুদিনের ইচ্ছে একুশের বইমেলায় যাব। পত্রিকায় পড়ি মেলার খবর, টেলিভিশনে দেখি। কত লোকজন, ছাত্রছাত্রী, জ্ঞানীগুণী, কবি-সাহিত্যিকরা মেলায় আসেন, কথা বলেন, কত অনুষ্ঠান হয় বইমেলায়। অবশেষে এবছর ১৬ ফেব্রুয়ারি সেই দিনটি আসল আমার জীবনে। আজ পুরোটা দিনই কাটলো বাংলা একাডেমির বইমেলায়। গেট দিয়ে ঢোকার পর বিশাল সোহরাওয়ার্দি মাঠ। সুন্দর সারিবদ্ধ প্যাভেলিয়ান আর দোকান। দারুণভাবে সাজানো হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণ। মূল মঞ্চে নানারকম অনুষ্ঠান হয় প্রতিদিন। আজও ছিল চমৎকার আলোচনা আর সংগীতানুষ্ঠান। কিছুক্ষণের জন্য আমিও দর্শকদের সারিতে বসে গান শুনলাম।

মেলার ঠিক মাঝখানে বাংলা একাডেমির প্যাভেলিয়ান। সুন্দরভাবে সজ্জিত। অসংখ্য ক্রেতা পছন্দের বইয়ের জন্য ভিড় করেছে সেখানে। আমার কয়েকটি বইয়ের দরকার ছিল, একটি কোষগ্রন্থ এবং অভিধান। জমানো টাকা দিয়ে তার কয়েকটি বই কিনে ফেললাম। বাংলা একাডেমি অনেকগুলো জীবনীগ্রন্থ বের করেছে এবার। সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখলাম। মেলার একপাশে ছিল শিশুদের জন্য চমৎকার আয়োজন– সিসিমপুর। কচিকাঁচাদের ভিড় সেখানে উপচে পড়ছে।

নতুন লেখকদের প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের জন্য নজরুল মঞ্চ রয়েছে মেলায়। প্রখ্যাত ব্যক্তিদের দিয়ে মূলত নতুন লেখকরা তাদের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করিয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশ পায় এই মেলার সময়। হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়লো নজরুল মঞ্চের দিকে। কয়েকজন তরুণ লেখক সেখানে অপেক্ষা করে আছেন তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য। অনেক প্যাভেলিয়ানে লেখকরা নিজেই বসে আছেন– উদ্দেশ্য তাঁদের বইবিক্রির সময় ক্রেতাদের অটোগ্রাফ দেওয়া। প্রখ্যাত লেখক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যারকে এই প্রথম স্বচক্ষে দেখলাম। অনেক তরুণ শিক্ষার্থী তাঁর অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

শেষ বিকেলে মেলা থেকে বেরিয়ে আসার পর ঘুরে দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কত সংগ্রাম আর গর্বের এই বিশ্ববিদ্যালয়। রাস্তার দুপাশে হরেকরকম জিনিসের দোকান। বাড়ির জন্য কয়েকটি সৌখিন জিনিস কিনে ফেললাম ছোট ভাইবোনকে দেয়ার জন্য। ভাবছিলাম আগামীকাল সকালেই আবার ফিরে যাব চিরচেনা গ্রামে কিন্তু বুকের ভেতর বয়ে নিয়ে যাব বইমেলার এই দারুণ উজ্জ্বল স্মৃতি।

সিলেটের দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের দিনলিপি

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

ফেব্রুয়ারির এই মিষ্টি শীতের সকালে সিলেটের শ্রীমঙ্গলে এসে পৌঁছালাম। সৌন্দর্যের চমৎকার লীলাভূমি এই সিলেট। শাহজালাল (রা.) ও শাহ পরানের (রা.) মাজার ছাড়াও প্রকৃতি অরূপ সাজে সজ্জিত। রাতে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে খুব ভোরে পৌঁছালাম শ্রীমঙ্গলে। বেশ খানিকটা সময় ঘুম আর বিশ্রাম। সকাল ১০টার দিকে বেরিয়ে পড়লাম টিলা আর চাবাগান দেখার জন্য। শ্রীমঙ্গল যে কতটা শ্রীমণ্ডিত তা না দেখলে বুঝতাম না। সিলেটে প্রায় ১৫০টি চা বাগান থাকলেও সবচেয়ে বড় চা বাগান এবং দেশের একমাত্র চা গবেষণা ইন্সটিটিউটও এই শ্রীমঙ্গলেই অবস্থিত। অনেকটা সময় নিয়ে

দেখলাম টিলা আর চা বাগানের মনোরম ছবি। আমাদের দেশ এত সুন্দর কখনো সেভাবে জানতাম না। হোটেল গ্রান্ড সুলতান দেখার সুযোগ হাতছাড়া করিনি আমরা। সেইদিনই দুপরের পর গেলাম লাউয়াছড়া ইকো পার্ক দেখতে। কত রকমের গাছপালা যে এখানে আছে তার ইয়ত্তা নেই। লাউয়াছড়ার অদ্ভুত নির্জনতা আর সবুজ দৃশ্য কিছুতেই ভুলে যাবার নয়। ফেরার পথে এখানকার বিখ্যাত সাতরঙা চায়ের স্বাদ নিতে ভুল করলাম না। কত রকমের চা যে এখানে আছে তা কে জানে। পিঠে বাচ্চা বেঁধে নিয়ে চা বালিকারা দারুণ আনন্দে চা পাতা তোলার দৃশ্যটি চোখে পড়লো। সারাদিন পাহাড়-টিলা আর চা বাগানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরলাম।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

আজ সারাদিন কাটল মাধবকুণ্ডের ঝর্ণায়। শ্রীমঙ্গল থেকে গাড়ি ভাড়া করে দেড় ঘণ্টায় আসি মাধবকুণ্ডে। এই ঝরনার কথা অনেক আগে শুনলেও কখনো সামনাসামনি দেখা হয়নি। এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই সুবিশাল পাহাড়ি ঝরনার সামনে। বনবনানির মধ্যে ঝরনার জল পড়ার অদ্ভুত শব্দ। অনেক উঁচু থেকে অবিশ্রাম জলের ধারা নেমে আসছে। ইচ্ছেমতো সেই জলে লাফালাফি করলাম সবাই মিলে। নানা ভঙ্গিতে ছবি তুললাম। পার্কের বাইরে কারুপণ্যের নানা জিনিস সাজিয়ে বসে আছে দোকানিরা। কিছু কেনাকাটার লোভ সামলাতে পারলাম না।

বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ওপর দিনলিপি

১৪ এপ্রিল ২০১৭

নববর্ষ বাঙালির প্রাণের উৎসব। এই উৎসব আমাদের ঐতিহ্যে রূপ নিয়েছে। এই উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন ও সংগ্রামের উজ্জ্বল ছবি। সারাদেশে আজ উদযাপিত হলো নববর্ষ। আজ ধর্মের কোনো ভেদ নেই, বর্ণের ভেদ নেই– আজ প্রত্যেকেই বাঙালি হয়ে শামিল হয় এই উৎসবে। কীভাবে দিনটি উদযাপন করবো এই পরিকল্পনাই করেছি গত কদিন থেকে। কলেজ মাঠেই নববর্ষের অনুষ্ঠান হবে এটা জানতাম। তাই অনেক সকালেই চলে আসলাম কলেজে। দেখলাম আমি আসার আগেই পৌঁছে গেছে আমার অনেক বন্ধুসাথি। আমাদের আনন্দ দেখে কে? নতুন ফতুয়া ধরনের একটি পোশাক পরেছিলাম। মঙ্গল শোভাযাত্রায় যোগ দিলাম সবাই। কলেজের অধ্যক্ষ স্যার, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রী ছাড়াও বাইরের শত শত নরনারী এই শোভাযাত্রায় শামিল হয়। ছোট্ট শহরটি প্রদক্ষিণ করলাম আমরা নেচেগেয়ে। রাস্তার দুপাশে অনেক মানুষ ভিড় করেছিল শোভাযাত্রা দেখার জন্য। শহরে যেন আনন্দের রঙ লেগেছিল।

শোভাযাত্রাটি কলেজমাঠে এসে শেষ হয়। দেখলাম মাঠের এক পাশে পান্তা-ইলিশের আয়োজন করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ, সহযোগিতায় ছিল একটি বহুজাতিক কোম্পানির স্থানীয় শাখা। মাঠের দক্ষিণ দিকে ঐতিহ্যবাহী পিঠেপুলির দোকানও চোখে পড়লো।

এরপর শুরু হয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং তারপর চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নববর্ষের ঐতিহ্য ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর কথা বললেন বিশিষ্টজনেরা। কবিতাপাঠ, আবৃত্তি, নাচ-গান সবই ছিল অনুষ্ঠানে। মেলায় হরেক রকমের জিনিস নিয়ে দোকান বসেছিল। সেখান থেকে পছন্দের টুকিটাকি জিনিস কিনলাম। এতসব হৈচৈ আনন্দের মধ্যে কখন যে বছরের নতুন দিনটি চলে গেল বুঝতেই পারলাম না।

কলেজে প্রথম দিনের অনুভূতির দিনলিপি

৪ এপ্রিল ২০১৭

কলেজ জীবন প্রত্যেক ছাত্রের কাছেই স্বপ্নের একটি দিন। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজের বড় পরিসরে প্রবেশ সব ছাত্রের কাছেই অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা। সেই অদ্ভুত অনুভূতি আজ আমার হচ্ছে। আমার আজ কলেজ জীবনের প্রথম দিন। গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে একটু বড় শহরের কলেজে ভর্তি হয়েছি। বুকে ভয় ভয় ভাব। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। তাড়তাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। গোসল সেরে খেতে বসে ঠিকমতো খেতে পারছিলাম না। কোনোরকমে মুখে কিছু দিয়ে ইউনিফর্মটা পরে নিলাম। আইডি কার্ড তখনও হয়নি বলে ভর্তি রশিদ দেখিয়ে প্রবেশ করলাম কলেজ প্রাঙ্গণে। সোজা চলে গেলাম ক্লাশ রুমে। ক্লাশভর্তি ছাত্র– সবাই অচেনা। পাশের জনকে নাম জিজ্ঞাসা করায় বলল ফারহান। খুব প্রাণবন্ত হাসিখুশি ছেলে। কথা হলো আরও কয়েকজনের সঙ্গে। দু'একজন ছাত্র বেশ দুরন্ত প্রকৃতির বলে মনে হলো। প্রথমেই বাংলা

ক্লাশ– যিনি প্রথম শিক্ষক হিসেবে বাংলা ক্লাশটি নিলেন তাঁর নাম অনাদিনাথ রায়। তিনি কথা বললেন অদ্ভুত সাবলীল ভঙ্গিতে। কলেজ জীবনে কীভাবে পড়ালেখা করতে হবে, আমরা যাতে অহেতুক সময় নষ্ট না করি– প্রতিটি মহূর্ত যেন কঠোর পরিশ্রম করি, না হলে কী ক্ষতি হতে পারে আমাদের, আমরা কে কী হতে চাই সেসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন এবং আমাদের কাছে জানতে চাইলেন। অনাদি স্যারের আন্তরিক ব্যবহার এবং আমাদের জন্য তাঁর উদ্বেগ সব ছাত্রকেই স্পর্শ করলো। এরপর আরও দুটো ক্লাশ হয়ে টিফিনের বিরতি। এই ফাঁকে পুরো কলেজটি ঘুরে দেখলাম। বিশাল ক্যাম্পাস, খেলার মাঠ, একদিকে একটি চমৎকার ঘাটলাবাঁধা পুকুর– তাতে শাপলা ফুটে আছে, বিরাট লাইব্রেরি, ক্যান্টিন, অডিটোরিয়াম– মুহূর্তেই মনটা গর্বে ভরে গেল। টিফিনের পরে আরও তিন পিরিয়ড শেষে যখন বাসায় ফিরছিলাম তখন এই আনন্দ হচ্ছিল যে, আমি আজ থেকে এরকম দারুণ একটি কলেজের ছাত্র। সারাদিন সারারাত এই আনন্দ আমাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

একটি বৃষ্টিমুখর দিনের দিনলিপি

২১ জুলাই ২০১৬

প্রচণ্ড গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। জানালা খুলে দেখি সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু এই সকাল অন্য দিনের মতো নয়। প্রবল বর্ষণের সঙ্গে চলছে বজ্রপাত। কিছুক্ষণ পর বজ্রপাত কমে গেল বটে কিন্তু বৃষ্টির আর বিরাম নেই। দুচোখে যেন আবারও রাজ্যের ঘুম নেমে এলো। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, যখন বিছানা ছেড়ে উঠলাম ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে, আর সেই সঙ্গে চলছে অবিরল বৃষ্টি। গরম এক কাপ চা নিয়ে জানালার পাশে বসলাম। গাছপালা ভিজছে, গাছের ডালে ভিজে চুপসে কাক বসে আছে এক ঠাঁয়। বাইরে যেতে না পেরে বাড়ির কুকুরটা মন মরা হয়ে বসে আছে। বারান্দায় হাঁস-মুরগিগুলো জড়ো হয়েছে। আমাকে একটুও ভয় পাচ্ছে না ওরা। আমার মতোই ওরাও বৃষ্টির দাপট দেখছে। মনে পড়লো বর্ষা ও বৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কবিতা ও গান রচনা করেছেন। মেঘলা দিনে কৃষ্ণকলি নামের কালো মেয়ের কালো চোখকে দেখেছিলেন কবি। কালিদাসের মেঘদূত তো সর্বকালের বিরহীর মনোবেদনাকেই প্রকাশ করেছে। হঠাৎ শুনলাম কাছেই কোথাও রেকর্ডে বাজছে – 'এমন দিনে তারে বলা যায় এমন ঘনঘোর বরিষায়' গানটি।

এতক্ষণ আমি বর্ষার একটি দিকই কেবল দেখছিলাম। নতুন আরেকটি দিক দেখলাম একটু পরেই। পত্রিকা বিক্রি করে পেট চালায় যে কিশোর ছেলেটি সে খুব দ্রুত চলে গেল ভিজতে ভিজতে। পত্রিকা বিক্রি করতে না পারলে আজ হয়ত ওকে না খেয়েই থাকতে হবে। সামনের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা রিক্সাগুলো যাত্রীর জন্য ব্যাকুল। কিন্তু খুব প্রয়োজন ছাড়া এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কে আর বাইরে বেরোবে? ভাবছিলাম সুখি মানুষের জন্য বৃষ্টি বিলাসিতার সুযোগ করে দিলেও গরিব খেটে খাওয়া মানুষের কাছে বর্ষা কখনোই রোমান্টিক কিছু না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। দিনলিপি কী ?

২। দিনলিপি রচনার শর্তসমূহ উলেøখ করুন।

৩। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে দিনলিপি রচনা করুন :

সুন্দরবন ভ্রমণের দিনলিপি, বনভোজন থেকে ফিরে এসে দিনলিপি, কলেজ থেকে শিক্ষাসফরে যাবার দিনলিপি।

পাঠ ৮.৯ : অভিজ্ঞতা বর্ণনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- অভিজ্ঞতা কী তা জবলতে পারবেন।
- অভিজ্ঞতা বর্ণনার কলাকৌশল সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

কোনো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনকেই অভিজ্ঞতা বলা হয়। অভিজ্ঞতাকে ইংরেজিতে Experience বলে। কোনোকিছু শিখনের মধ্য দিয়ে মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মানুষ সাধারণত দুইভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। প্রথমটি হলো ইন্দ্রিয়জাত অনুভবেব মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়টি দেখেশুনে ও হাতেকলমে। কাজেকর্মে সংযুক্ত হলে মানুষকে ভালোমন্দ নানারকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। এই অভিজ্ঞতা তাকে ভবিষ্যতে সঠিক সচেতনভাবে চলতে সাহায্য করে।

কোনো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনকেই অভিজ্ঞতা বলা হয়।

অভিজ্ঞতা বর্ণনের কলাকৌশল

১. একটি অখণ্ড ভাবের মধ্যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে হয়।
২. বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়।
৩. অভিজ্ঞতা বর্ণনায় ভূমিকা, মূল অংশ ও উপসংহার থাকতে পারে। আলাদাভাবে লেখা যেতে পারে, একসঙ্গে একটি অখণ্ড ভাবের মধ্যেও প্রকাশ করা যেতে পারে।
৪. অভিজ্ঞতা বর্ণনার ভাষা হবে সহজ-সরল-সাবলীল।

শিলাইদহের আলোকিত দিনে

শিলাইদহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামটি জড়িত একথা আমাদের ভালোভাবেই জানা ছিল। কবির লেখায় কুষ্টিয়ার শিলাইদহ গভীরভাবে জড়িত। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কুষ্টিয়ার সুনাম রয়েছে। বাউল সাধক লালনের জন্ম ও সাধনা এই শিলাইদহের মাটিতে। অমর রচনা 'বিষাদ–সিন্ধু'র রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেনের পৈত্রিক ভিটা কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায়। এর পাশেই রয়েছে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক কাঙাল হরিনাথের বসতভিটা। এক শীতের সকালে বন্ধু অতনু ও আমি মিলে রওনা হলাম কুষ্টিয়ার উদ্দেশে। আগে কখনো যাওয়া হয়নি তাই কেমন যেন একটা শঙ্কা কাজ করছিল বুকের ভেতর। যাত্রাপথে বাসের ভেতর দারুণ কাটছিল। সঙ্গে নানারকম টুকিটাকি খাবার, আচার, বিস্কুট নিয়েছিলাম। বিকেল নাগাদ ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া বাস টার্মিনালে গিয়ে পৌঁছলাম। ঝটপট কাছের একটি হোটেল 'রজনীগন্ধায়' দুজনের জন্য ডাবল একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে নিলাম। রুম ভাড়া ঢাকার তুলনায় অনেক সস্তা, হোটেলে খাবারের দামও তুলনামূলকভাবে কম। পদ্মার টাটকা ইলিশ দিয়ে ভাত খেতে দারুণ লাগছিল। হোটেল ম্যানেজারকে শিলাইদহে যাবার উপায় জিজ্ঞাসা করলে বললেন যে, আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন গিয়ে তেমন কিছু দেখা যাবে না। বরং আজ রাতে বিশ্রাম নিয়ে একেবারে তরতাজা হয়ে আগামীকাল সকালে বেরিয়ে পড়ুন। বাসে কুষ্টিয়া শহর থেকে শিলাইদহে যেতে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগে। আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম যে, সারাদিন আজ শিলাইদহের সমস্ত বিখ্যাত জায়গা ঘুরে দেখব। সকাল নয়টার দিকে বাসে উঠে পড়লাম। গড়াই সেতু পার হয়ে চলেছি– দুধারে গ্রামের পর গ্রাম, অবারিত সবুজ, বয়ে চলা গড়াই নদী। শীতের সময় গড়াইতে তেমন পানি না থাকলেও ধুধু বালিরাশি এক চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। গড়াই সেতু পার হবার আরও আধা ঘণ্টা পর শিলাইদহে গিয়ে পৌঁছলাম। ভাবছিলাম কবি রবীন্দ্রনাথ যখন এখানে এসেছিলেন তখন তো এরকম সুন্দর রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না। কত কষ্ট করে নদীপথে নৌকায় করে কবিকে যাতায়াত করতে হয়েছে। কুঠিবাড়ির সামনেই বিশাল মাঠ– এই মাঠের পথেই হয়ত গগন হরকরা হেঁটে আসতেন তাঁর সেই বিখ্যাত গান গাইতে গাইতে– 'আমি কোথায় পাব তারে আমার

মনের মানুষ যে রে –'। দশ টাকায় টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। মনটা আনন্দে ভরে গেল। কী বিশাল বাসভবন, কী চমৎকার সিঁড়ি। দোতলায় উঠে কবির ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র দেখলাম। পদ্মার বুকে যে বোটে করে কবি চলাচল করতেন সেই বোটটিও দেখলাম। দোতলার ঘরে বসেই তিনি লিখেছিলেন বিখ্যাত 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি। এ ছাদে দাঁড়িয়েই তিনি বিস্তৃত পদ্মার রূপ দেখতেন। সবচেয়ে অবাক হলাম কবির আঁকা অনেক ছবি দেখে। এত ছবি তিনি এঁকেছেন তার কিছুই আমরা জানতাম না। এখানেই 'সোনার তরী' 'মানসী' কাব্যের অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, ছিন্নপত্রের পাতায় লেখা হয়েছে কবির বিচিত্র অনুভূতির কথা। কুঠিবাড়ির সীমানা প্রাচীরটিও দেখার মতো। পদ্মার ঢেউয়ের মতো প্রাচীরটি ঢেউ খেলানো। কুঠিবাড়ির পেছনেই পদ্মার ঘাটে একসময় কবির 'পদ্মা' নামক বোটটি এসে ভিড়ত। এখন এই ঘাটে কত নৌকা এসে ভিড় করে। এই পদ্মাবোটে বসে কবি গ্রামের সহজ-সরল মানুষের জীবনকে দেখেছেন, তাঁর লেখায় চিত্রিত হয়েছে সেইসব নরনারীর ছোট ছোট সুখ-দুঃখের কাহিনি। বন্ধু অতনু আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানালো; জোর করে ওকে এখানে নিয়ে আসার জন্য। এখানে না আসলে নাকি ওর জীবন অসম্পূর্ণই থেকে যেত। বিকেলে শিলাইদহ থেকে ফেরার পথে মীর মশাররফ হোসেনের ভিটেমাটি, তাঁর বসতগৃহ, তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল দেখার সৌভাগ্য হলো। কাঙাল হরিনাথের সেই বিখ্যাত ছাপাযন্ত্রটিও দেখলাম তাঁর বসতবাড়িতে। তাঁর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র কয়েকটি পুরনো কপি দেখে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান বলে মনে হলো। দুদিনের কুষ্টিয়া সফরের তরতাজা স্মৃতি নিয়ে পরদিন ঢাকার পথে রওনা হলাম।

ছিটমহলের পথে পথে

দাসিয়ার ছড়া একটি ছিটমহল– উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম জেলায় এটি। মিডিয়া আর পত্রপত্রিকার কল্যাণে এই ছিটমহলের নাম সবার হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছে। এখানকার মানুষের কথা, তাদের জীবনযাপনের কথা, সুখদুঃখের কথা এতবার শুনেছি যে, সিদ্ধান্ত নিয়েই নিলাম একবার ওখানে যাব। সব ঠিকঠাক করে গত সপ্তাহে রওনা দিলাম কুড়িগ্রামের পথে। যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু পেরিয়ে যেতে হয়। উত্তরবঙ্গে আগে কখনো যাইনি আমি। কেমন সেখানকার পথঘাট, পরিবেশ কিছুই জানা ছিল না। দাসিয়ার ছড়াটি একেবারে ফুলবাড়ি সীমান্ত এলাকায় বলে শুনেছি কিন্তু সেটা যে আসলে কতদূর কোনো ধারণাই ছিল না। যাদের সে ধারণা ছিল তারা বলেছিল ৭ ঘণ্টার পথ। কিন্তু রওনা হবার পর মনে হলো পথ আর শেষ হয় না। সঙ্গে ছিল আবির ও প্রবীর। আমার চেয়েও বেশি উৎসাহী তারা। বঙ্গবন্ধু সেতু পার হবার আধা ঘণ্টা পরে একটি রেস্টুরেন্টে যাত্রাবিরতি দেয়া হলো। মাথা ঝিমঝিম আর বমি বমি ভাব লাগছিল। তেমন কিছুই খেলাম না। শুধু এক কাপ গরম চা খাবার পরে মাথা ধরাটা ছেড়ে গেল বলে মনে হলো। বিরতির পর আবারও ছুটল গাড়ি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুঝলাম কেন উত্তরবঙ্গকে শস্যভাণ্ডার বলা হয়। যেদিকে তাকাই শুধু সবুজ আর সবুজ। কোথাও সবুজ ক্ষেতের কোনো কমতি নেই। বাতাসে সবুজ-সোনালি শস্যের মাথা দোলানি না দেখলে বোঝার উপায় নেই কেন বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। অনেকগুলো জেলা পেরিয়ে গেলাম একে একে। বঙ্গবন্ধু সেতুর পরই উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার সিরাজগঞ্জ। সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্ম এই জেলায়। সিরাজগঞ্জের পরই শেরপুর হয়ে মহাস্থানখ্যাত বগুড়ায় প্রবেশ করলো আমাদের বাসটি। ইতিহাসের বিখ্যাত পুণ্ড্রবর্ধন নগরী এই বগুড়ার মহাস্থান নামক জায়গায়। এর পাশ দিয়ে বাসটি যাবার সময় মনে হচ্ছিল আমরা সেই প্রাচীন ইতিহাসে ফিরে গেছি। কতোকাল আগে এই জনপদেই গড়ে উঠছিলে সমৃদ্ধ এক সভ্যতা। বইয়ে পড়েছি এখানে প্রাপ্ত বৌদ্ধবিহারসহ নানা স্থাপত্য নিদর্শনের কথা। বগুড়ার পরই ঢুকলাম রঙ্গপুর তথা রংপুরে। মনে পড়লো রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কথা– এই রংপুরের পায়রাবন্দে জন্মে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন নারী জাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে। সন্ধ্যার পর আমাদের বাসটি সীমান্ত এলাকা ফুলবাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। ছোট একটি হোটেলে উঠে সেদিনের মতো বিশ্রামে গেলাম। পরদিন গেলাম সেই বহুল আলোচিত দাসিয়ার ছড়া ছিটমহলে। ফুলবাড়ি সদর থেকে দাসিয়ার ছড়ার দূরত্ব ৬ কিমি। ওখানে পৌঁছানোর পর এক অন্যরকম অনুভূতি হলো আমাদের। দীর্ঘদিনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে তারা–একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হবার চরম আনন্দে তারা আত্মহারা। ঘরে ঘরে অনেকের সঙ্গে কথা বললাম, তাদের চোখেমুখে চরম খুশির উচ্ছ্বাস। এখন আর তাদের কারো কাছে মাথা নত করতে হবে না, নিজের পরিচয় নিয়ে আর কোনো ভয় থাকবে না, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ালেখা করতে পারবে, এলাকার উন্নতি হবে– এইসব কথা মনে করে তাদের আনন্দ দেখে কে। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়েছে কয়েকটি জায়গায়। দু-একটিকে অফিস বা ক্লাবঘর ধরনের মনে হলো। নেতাগোছের কয়েকজনকে দেখলাম রাস্তায় বাজারে সঙ্গীসাথিসহ কী যেন সব বলছে। কিন্তু আমাদের এই অভিজ্ঞতা আর

একরকম রইল না। এক জায়গায় খুব কান্নাকাটি শুনে সেখানে এগিয়ে গেলাম। দেখি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে দুজন মেয়ে-পুরুষ কাঁদছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওরা ভারতে চলে যাবে, তাই আজন্মের ভিটামাটি ছেড়ে চলে যাবার সময় এই বুকফাটা কান্না। এরকম আরও কয়েকজনকে দেখেছি নানা কারণে তারা ভারতে যেতে বাধ্য হচ্ছে বটে কিন্তু এদেশ ছেড়ে চলে যেতে তাদের কোনো ইচ্ছাই ছিল না। স্বদেশভূমির টান যে কত গভীর এই প্রথম কাছ থেকে দেখলাম। জন্ম থেকে যে ভিটায় বড় হয়েছে– সেই ভিটা, ঘর, পুকুর, জমি, গাছপালা, গরুছাগল ছেড়ে যেতে কে-ই বা চায়। এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা নিয়ে আমরা সেদিন রাতে হোটেলে ফিরে আসলাম। মনে হলো পত্রিকা বা মিডিয়ায় দাসিয়ার ছড়া নিয়ে অনেক উচ্ছ্বাস দেখা গেলেও তার আড়ালে কত মানুষের কান্না আর দীর্ঘশ্বাসও মিশে আছে। বুকের ভেতর দারুণ এক কষ্ট আর আনন্দ নিয়ে ফিরে চললাম নিজ ঠিকানায়।

লোকশিল্প জাদুঘর

সোনারগাঁওয়ের নাম শুনেছি সেই কবে। ঘুরে বেড়ানোর নেশাটাও আমার পুরোনো। হুট করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা তিনজন। ছাত্র হিসেবে তুখোড় নই, ভ্রমণকারী হিসেবে কিছুটা নাম আছে। সেই নামের মর্যাদা রাখতে সোজা গিয়ে হাজির হলাম সোনারগাঁওয়ে। সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার রাজধানী। এ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন ঈশা খাঁ। ঈশা খাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সোনাবিবি। এই সোনাবিবির নামানুসারে এর নাম হয় সোনারগাঁও। সেই সোনারগাঁওয়ে গড়ে উঠেছে বাংলার লোকশিল্প জাদুঘর। ১৯৭৫ সালে এই ঐতিহাসিক স্থানে জাদুঘরটি গড়ে উঠে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টায়। এই জাদুঘরে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। লোকশিল্প গড়ে ওঠে সাধারণ অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের দ্বারা। তাদের কল্পনা ও দক্ষতার স্পর্শে সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ সব শিল্পকর্ম। কত বিচিত্র জিনিস তারা তৈরি করেছে, না দেখলে বিশ্বাস করার উপায় নেই। মাটির মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভার স্বাক্ষর এইসব শিল্পকর্ম। মাটি, বাঁশ ও বেত দিয়ে কত জিনিস তারা তৈরি করেছে। কাঠ ও মাটির পুতুল, মুখোশ, নানা ধরনের শৌখিন পাত্র, অলংকার– সবকিছুই নিখুঁতভাবে তৈরি হয়েছে। সৌন্দর্য আর লাবণ্যে ভরপুর সব জিনিস। নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তারা এগুলো সৃষ্টি করেছে। তাদের নৈপুণ্য দক্ষতা, ধৈর্য ও কল্পনাশক্তির তুলনা নেই। নকশিকাঁথার এক বিপুল সম্ভার দেখলাম এই জাদুঘরে। গ্রামগঞ্জে তৈরি আরও নানারকম সূচিকর্ম দিয়ে সাজানো জাদুঘরটি। নগরজীবনে থেকে আমরা হয়ত অনেকেই এইসব লুকানো প্রতিভার মূল্য বুঝি না। এরপর ঢুকলাম 'জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালায়'। জয়নুলের আঁকা বিচিত্র ছবির এই সংগ্রহটি আমাদের অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি ছবিতে রয়েছে শিল্পীর দেশপ্রেম, মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা। অপূর্ব তাঁর তুলির কাজ। জয়নুলের ছবিতে সমগ্র বাংলাদেশ তার প্রকৃতি নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দুর্ভিক্ষের ওপর আঁকা তাঁর বিখ্যাত ছবি 'ম্যাডোনা–৪৩' দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ স্মৃতিকেই মনে করিয়ে দেয়। 'বিদ্রোহী' ছবির ষাঁড়টি যেন দড়ি ছিঁড়ে এখনি তাড়া করবে আমাদের। ভাওয়াইয়া গানের গাড়িয়াল ভাইয়ের সেই গাড়ির চিত্র দেখে মন ভরে গেল। মনে হলো শহরের মধ্যে আমরা একটুকরো গ্রামকে খুঁজে পেলাম। বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির উজ্জ্বল ছবি ধরা পড়েছে এই লোকশিল্প জাদুঘরে। বাঙালি হিসেবে আমিও এই গৌরবের অধিকারী– এই ভেবে হৃদয় আনন্দে হেসে উঠল।

যানজটের দীর্ঘ সারি

যানজটে কাহিল হতে হয় প্রতিনিয়ত। ঢাকা এখন যানজটের শহর। যানজট এখানে উৎসবের মতো। মেসে থেকে কলেজে পড়াশুনা করি। প্রতিদিনই যাতায়াতে জ্যামে পড়তে হয়, এ আর নতুন কী ? কিন্তু সেদিনের সেই যানজটের অভিজ্ঞতা মনের পাতায় তুলে রেখেছি। বাড়ি থেকে খবর এসেছে মা অসুস্থ। যেতে হবে রংপুর। মাথা কাজ করছিল না একদম। দুপুরে নাকেমুখে একটু খাবার গুঁজে রওনা দিলাম গাবতলির দিকে। ওখান থেকেই বগুড়ার বাস ধরব। আরামবাগ থেকে দুপুর দুটায় লোকাল গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু মনে হলো হেঁটে রওনা হলে ভালো করতাম। একদম গাড়ি নড়ছে না। একটু এগোয় আবার স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। মনটা একদম ভালো ছিল না। বারবার মায়ের কথা মনে পড়ছিল। কত কষ্ট করে তিনি আমাকে শহরে পাঠিয়েছেন পড়ালেখার জন্য। মায়ের একটিই স্বপ্ন– ভালো রেজাল্ট করে পছন্দমতো কোনো জায়গায় ভর্তি হই। কোনোকিছুই মা জোর করে আমার ওপর চাপিয়ে দেন না। আমার ওপর মায়ের অগাধ বিশ্বাস। সেই মাকে গিয়ে সুস্থ দেখতে পাব তো? আরামবাগ থেকে শাহবাগ আসতেই বিকেল চারটা। সারি সারি গাড়ির ভিড়। অসহ্য গরমে ঘেমেনেয়ে

উঠেছে সবাই। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে গরম আরও তীব্র মনে হলো। কেউ কেউ পত্রিকা দিয়ে বাতাস করছে। এসবের মধ্যে দুএকজন দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে। গালাগালি চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ আসছে আশপাশ থেকে। বাইরে তাকিয়ে দেখি ফুলবালিকা– প্রাইভেট কারের জানালা দিয়ে উঁকি মারছে। হাতে গাঁদা ফুলের মালা আর রজনীগন্ধার স্টিক। কতভাবে কাকুতিমিনতি করছে ফুল বিক্রির জন্য। এই বয়সে যাদের স্কুলে যাবার কথা তারা ফুল ফেরি করছে, যাদের হাতে থাকার কথা বইপুস্তক, কলম-খাতা তাদের হাতে ফুলের গাদা। কেউ কেউ ফুল কিনল ওদের কাছে নিরুপায় হয়ে, অনেকে ভীষণ রাগ দেখালো। শামুকের গতিতে এগোচ্ছে বাসটি। ফুটপাতের দিকে চোখ গেল। নানা বয়সী ভিক্ষুকের মেলা। বিচিত্র ভঙ্গিতে চিৎকার করে তারা ভিক্ষা করছে। অনেকেই দেখলাম ভিক্ষা দিচ্ছে। অধৈর্য হয়ে অনেকে গালিগালাজ করছে ট্রাফিক পুলিশকে, কেউবা জোরে জোরে হর্ন বাজাচ্ছে মেজাজ খারাপ করে। হোটেল শেরাটন পার হয়ে বাংলা মোটরের দিকে যেতে যেতে দেখি একজন ফুটপাত দিয়ে খুব জোরে দৌড়াচ্ছে। শুনলাম ছিনতাইকারী, কার যেন সোনার চেইন টান দিয়ে দৌড়। তাকে ধরার জন্য পিছে পিছে কয়েকজন দৌড়াচ্ছে। জ্যাম ছাড়া এখন আর ঢাকা শহরকে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেদিনের জ্যাম সব রেকর্ডকেই বুঝি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রাগে গজড়াতে গজড়াতে অনেকে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হাঁটা ধরল। কোন একজন ভিআইপি নাকি এই পথ দিয়ে যাবেন– তাই এই অবস্থা। একটুপর বাস আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো। যখন গাবতলি গিয়ে পৌঁছলাম নির্দিষ্ট গাড়ি ছেড়ে গেছে। অতএব নিরুপায় আমি পরের ট্রিপের জন্য বসে রইলাম একাকী।

লালবাগ কেলøা

ইতিহাস আর ঐতিহ্যের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। ইতিহাসের নানা নিদর্শন ছড়িয়ে আছে দেশের নানা প্রান্তে। ঢাকা শহরের লালবাগ কেলøার কথা বইয়ে পড়েছি। এবার শীতের ছুটিতে ঠিক করলাম আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ঢাকায় বেড়াতে যাব এবং লালবাগ কেলøা মন ভরে দেখবো। রাজশাহী থেকে আমরা তিন বন্ধু ঢাকায় চাচার বাড়িতে এসে উঠলাম– দুদিন থাকব, আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম। চাচার বাসার একটি কক্ষে আমাদের তিনজনের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন চাচা-চাচি। বিকেলে ঢাকায় পৌঁছে রাতে বিশ্রাম নিলাম। চাচার কড়া নির্দেশ না বলে-কয়ে যেন ঢাকায় কোথাও না যাই। গেলে নাকি হারিয়ে যাবার ভয় আছে। সঙ্গে টাকাপয়সা কীভাবে রাখতে হবে, কীভাবে ছিনতাইকারির হাত থেকে দূরে থাকতে হবে এরকম নানা পরামর্শ দিয়ে চললেন। চাচা-চাচির ধারণা যে, প্রথম ঢাকায় এসেছি, না জানি কী হয়।

সব পরামর্শ মাথায় রেখে সকালবেলা আমরা তিন বন্ধু টিকেট কেটে লালবাগ কেলøায় প্রবেশ করলাম। পুরোনো ঢাকার রিয়াজউদ্দিন রোডে এই কেলøা।

কী বিশাল কেলøার তোরণ বা ফটক। বড় ফটকটা দিয়ে ঢুকলাম। অন্য দুটি দরজা বন্ধ। গেরুয়া রঙের প্রাচীর, ফটক সহজেই নজর কাড়ে। তোরণ দিয়ে ঢুকেই মনটা আনন্দে ভরে গেল। সামনেই বিশাল সুসজ্জিত বাগান– ফুলে ফুলে সাজানো। হরেক রকমের ফুলের মধ্যে গোলাপের সমারোহই বেশি চোখে পড়লো। একটু এগিয়ে গেলেই সামনে পরীবিবির সমাধিসৌধ। ইতিহাসখ্যাত সুবেদার শায়েস্তা খাঁয়ের প্রিয়তম কন্যা পরীবিবি। কত সালে কীভাবে তার মৃত্যু হয় সেটা জানা না গেলেও ধারণা করা হয় ১৬৮৭–১৬৮৮ সালে পরীবিবির মৃত্যু হয়। প্রিয় কন্যার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য শায়েস্তা খাঁ এই অপূর্ব ইমারত নির্মাণ করেন। মূল্যবান পাথর, কষ্টি পাথর এবং নানারকম ফুল-লতা-পাতায় শোভিত টালি দিয়ে ইমারতটি অলংকৃত। এই ইমারতের ভেতরে নয়টি কক্ষ আছে। কক্ষগুলোর ওপরের অংশ গম্বুজাকৃতি এবং কষ্টিপাথরে শোভিত। সমাধিসৌধের মূল গম্বুজটি দামি তামার পাত দিয়ে আবৃত। আরও সমাধি আছে এখানে, আছে ফোয়ারা, পাহাড়ের মতো উঁচু টিলা এবং সুড়ঙ্গ পথ। কেলøার দক্ষিণ দিকে রয়েছে তোপমঞ্চ। কেলøার পূর্বদিকে রয়েছে ঘাট বাঁধানো পুকুর, চমৎকার সিঁড়ির ব্যবস্থা রয়েছে পুকুরটিতে। এর পেছনেই দেখা যায় সেই সময়ের সৈনিক ব্যারাক। এখন এটি আনসার ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। লালবাগ কেলøা মসজিদটিও দেখলাম– যেটি নির্মিত হয়েছে শাহজাদা আযমের সময়। সুবাদার আযম ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র। আয়তাকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি মোগল স্থাপত্যের অনুপম দৃষ্টান্ত। যতই দেখি ততই বিস্মিত হই। এই বিস্ময় নিয়েই দেখলাম শায়েস্তা খাঁয়ের বাসভবন এবং তার দরবার মহল। আরও আছে সে সময়ে ব্যবহৃত মানচিত্র, তৈজসপত্র, সোরাহি ও শিলা পাথর।

এছাড়াও সতের-আঠার শতকের আরও অনেক নিদর্শন দেখার সুযোগ হলো– বর্শাফলক, লোহার জালের বর্ম ছোরা, খাপ, তীর, বর্শা, পাত্র, ঢাল, তরবারি, বন্দুক, রাইফেল, সৈনিকদের পোশাক, রাজপোশাক ইত্যাদি। সতের শতকে পারস্যে তৈরি

চমৎকার কার্পেট, ঝাড়বাতি, ল্যাম্প, জায়নামাজ, আওরঙ্গজেবের শাসনামলে মসজিদ ও বাগান তৈরির বিবরণসংবলিত শিলালিপি। রাজার প্রতিকৃতি, শাহজাদা আযম শাহের প্রতিকৃতি, সিংহাসনে আওরঙ্গজেবের প্রতিকৃতি, যুবরাজ ও রাজকন্যার অশ্বচালনার ছবি আমাদের যেন ইতিহাসের সেই প্রাচীন সময়ে নিয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা কীভাবে কেটে গেল জানি না। আনন্দ আর বিস্ময় নিয়ে ফিরে চললাম বাসায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। অভিজ্ঞতা বলতে কী বোঝায় ? অভিজ্ঞতা বর্ণনার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন :

জাতীয় যাদুঘর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, সেন্টমার্টিনে এক রাত, রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা

পাঠ ৮.১০ : ভাষণ লিখন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ভাষণ কী তা লিখতে পারবেন।
- ভাষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সার্থক ভাষণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কোনো সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠানে বক্তা যা বলেন অর্থাৎ তার বক্তব্যকে সাধারণত ভাষণ বলা হয়। বাচন বা বাকশিল্পের একটি বিষয় হলো ভাষণ। বিভিন্ন প্রয়োজনে সভা-সমিতিতে, নানা অনুষ্ঠানে কিংবা আয়োজনে বা কোনো আলোচনায় অনেককে বক্তব্য প্রদান করতে হয়। ভাষণে কোনো বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করতে হয়। ভাষণ মাধুর্যমণ্ডিত ও সাবলীল হওয়া উচিত। প্রাচীন গ্রিস ও রোমে বক্তৃতাবিদ্যা বা বাগ্মিতার চর্চা করা হতো। বাগ্মিতার জন্য গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস স্মরণীয়। এডমন্ড বার্ক ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে অভিভূত করেছিলেন তাঁর বাগ্মিতা দ্বারা। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। যিনি ভাষণ দেন তাকে বলে বক্তা এবং যারা সেই বক্তব্য শোনেন তাকে বলা হয় শ্রোতা। ভাষণে কোনো একটি বিষয়কে সাবলীল ও আকর্ষণীয়ভাবে শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করতে হয়।

কোনো সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠানে বক্তা যা বলেন অর্থাৎ তার বক্তব্যকে সাধারণত ভাষণ বলা হয়। বাচন বা বাকশিল্পের একটি বিষয় হলো ভাষণ।

ভাষণের প্রয়োজনীয়তা

সাধারণত কোনো একটি বিষয় শ্রোতা-দর্শকদের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ভাষণের গুরুত্ব অনেক। কোনো বিষয়ে জনমত গঠনে অথবা কোনো পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণের সমর্থনে ভাষণ খুব কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ভাষণের উদ্দেশ্য হলো কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে মানুষকে বুঝিয়ে বলা।

সার্থক ভাষণের বৈশিষ্ট্য

১. বিষয়বস্তু সম্পর্কে বক্তার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
২. বক্তব্যে যুক্তি ও ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। এলোমেলো বক্তব্য শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে পারে না।
৩. বক্তব্যে আবেগ-আন্তরিকতা ও বক্তার গভীর বিশ্বাসের ছাপ থাকতে হবে যাতে শ্রোতারা মনে না করে যে, তিনি কৃত্রিম কথা বলছেন।
৪. ভাষণে চলিত ভাষা ব্যবহার করতে হবে– সাধুভাষা গ্রহণযোগ্য হয় না।
৫. উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি সুন্দর হলে ভাষণ শুনতে ভালো লাগে।
৬. ভাষণে আঞ্চলিকতা ও অন্যান্য মুদ্রাদোষ পরিহার করা উচিত।

কতিপয় ভাষণের নমুনা

‘নবীনবরণ’ অনুষ্ঠানে নবাগতদেরকে স্বাগত জানিয়ে একজন ছাত্রের ভাষণ তৈরি করুন।

আজকের এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ এবং যাদের জন্য এই আয়োজন সেই নবাগত শিক্ষার্থী ভাইবোনেরা– প্রথমেই সবার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

স্কুল জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে তোমরা আজ কলেজ জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছ। তোমাদের চোখেমুখে উচ্ছ্বাস আর আনন্দ। নতুন জীবনের স্বপ্ন তোমাদের চোখে। নিয়ম আর ঐতিহ্য মেনে আমরা একাদশ শ্রেণির নবাগত ছাত্রছাত্রীদের বরণ করে নিই প্রতিবছর। এবছরও তার ব্যতিক্রম নয়। এই কলেজের সুন্দর পরিবেশে তোমাদের সবাইকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও সাদর সম্ভাষণ।

নবীন শুভার্থী ভাইবোনেরা

সময়ের টানে কারো শুরু হয়, কারো বা হয় শেষ। এ অঞ্চলের স্বনামধন্য এই কলেজে পুরোনোদের বিদায় আর নতুনদের আগমন চিরাচরিত একটি প্রথা। সেই প্রথা মেনেই আজ তোমরা একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পদার্পণ করলে পবিত্র কলেজ প্রাঙ্গণে। এই যাওয়া আসার মধ্য দিয়েই জীবন বয়ে চলে। ফুলেল শুভেচ্ছায় তোমাদের অভিনন্দন। অল্প কিছুদিন পরেই হয়তো তোমরা আমাদের বিদায় জানাবে। আমাদের দ্বাদশ শ্রেণির পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই উদাত্ত অভিনন্দন।

প্রিয় নবীন শিক্ষার্থীরা

প্রকৃতিতে প্রাণের স্পর্শ আজ। আকাশ জুড়ে আনন্দধ্বনি। প্রকৃতির এই আনন্দ সাড়া ফেলেছে চারদিকে। তোমরা প্রকৃতির এই মধুর হিলেøালে ভেসে এই কলেজে পা রেখেছ। তোমাদের পদচারণায় মুখর এই কলেজ। তোমাদের জ্ঞান ও চেতনাকে জাগ্রত করবে এই প্রতিষ্ঠান। প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায় না। শিক্ষিত মানুষ না হলে দেশ-জাতির মুক্তিও সম্ভব হবে না। আমরা প্রত্যাশা করি এই শিক্ষালয়ে তোমরা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। বিনয় ও নম্রতা তোমাদের আলোকিত করে তুলক।

সোনালি সন্তানেরা

প্রাণপ্রিয় এই কলেজে শিক্ষকেরা হলেন পিতামাতার মতো। তাদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের বন্ধনটিও গভীর। শুধু ক্লাশের পড়া নয়, তার বাইরেও সংস্কৃতি-খেলাধুলার এক ঐতিহ্য রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের। শিক্ষার্জনের পাশাপাশি সংস্কৃতিতেও তোমরা এগিয়ে যাবে প্রত্যাশা রইল আমাদের।

মুক্তির অগ্রদূতেরা

নবীন ছাত্রছাত্রীরা,তোমরা মনে রাখবে শিক্ষা মানে আলো– শিক্ষা মানে মুক্তি। ভালোভাবে লেখাপড়া শেষ করে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে তোমাদের। কিন্তু কেবল নিজেরা ভালো থাকলেই চলবে না– দেশ-জাতির মুক্তি ও উন্নতির জন্য তোমাদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে তোমাদের সেই শক্তি অর্জন করতে হবে। তোমাদের চলার পথ সুন্দর হোক, আনন্দময় হোক সেই কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

‘নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থাপনের জন্য প্রধান অতিথির একটি ভাষণ রচনা করুন।

সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ এবং মঞ্চের সামনে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী– আপনাদের সবার প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

সুধীবৃন্দ, আমরা জানি নারী পুরুষের সম্মিলিত অবদানেই আজকের পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। নারী হিসেবে কাউকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সৃষ্টির প্রথম থেকেই পুরুষের সাথে সাথে নারীরাও কাজে অংশগ্রহণ করেছে। মাতৃনির্ভর সমাজ ছিল একসময়। কিন্তু সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষ আজ নানাভাবে নারীদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের ঘরের ভেতরে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। শিক্ষাদীক্ষা-জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি-গবেষণা সবকিছু থেকে নারীদের দূরে ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত চলছে। কিন্তু এর ফলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। মেয়েদের অংশগ্রহণ ছাড়া দেশ এগোতে পারে না। তাই নারীদের শিক্ষা অপরিহার্য।

সম্মানিত সুধী

সময় অনেক পাল্টে গেছে। কাউকে আর ঘরের ভেতর বন্দি করে রাখার দিন নেই। ধর্মের নামে, নৈতিকতার নামে, সমাজরক্ষার নামে নারীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখার কোনো সুযোগ নেই। রক্ষণশীলতা একটি ব্যাধি। মানবিক সমাজ তৈরির জন্য নারীপুরুষ সবাইকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে। আমরা জানি যে, আমাদের দেশের মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সংসদের স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেত্রী সবাই নারী। এছাড়াও নারী বিচারপতি, নারী মন্ত্রী, নারী প্রশাসক, নারী বৈমানিক সবই আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নারীদের সামগ্রিক মুক্তি ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে এখনো নারীরা নানারকম শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

প্রিয় নাগরিক সমাজ

ঐতিহাসিকভাবেই এ অঞ্চলে সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে দেরিতে। বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, তালাক ব্যবস্থা, কথায় কথায় নারীদের উপর পরিবারের অত্যাচার এখনো হরহামেশাই ঘটছে। পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়বে এরকম অসংখ্য ঘটনার কথা। এসবের প্রতিকারে আমাদের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শুধু শহরে বসে নারীদের জন্য হাহুতাশ করলেই চলবে না। তার জন্য থাকতে হবে সত্যিকারের দরদ।

প্রিয় শিক্ষিত সমাজ

নারীশিক্ষার প্রসারে এবং বেশি সংখ্যায় মেয়েদের লেখাপড়ায় নিয়ে আসার জন্য নানা রকম উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বৃত্তি-উপবৃত্তিসহ আরও অনেক সুযোগ তৈরি করেছে সরকার নারী শিক্ষার বিস্তারে। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে অনেক স্কুল-কলেজ গড়ে উঠলেও মেয়েরা কতটা শিক্ষিত হচ্ছে তার কোনো পরিসংখ্যান আমাদের নেই। বাস্তবক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়াও সাধারণ পরিবারে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে অনেকেরই আপত্তি আছে। অনেক পিতা-মাতা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোকে অর্থের অপচয় বলে মনে করে। একধরনের রক্ষণশীল পুরুষ নারীদের কেবল ঘরসংসারে বন্দি রাখাকে পছন্দ করে ও তাদের ভোগের সামগ্রী বলে মনে করে। নানারকম কেতাব ঘেঁটে তারা দেখানোর চেষ্টা করে নারীশিক্ষার দরকার নেই। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নারীরা বীরত্বের ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে। তারা মিছিল করেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র চালিয়েছে, আহত যোদ্ধাদের সেবা দিয়েছে ক্যাম্পে। নানা বাঁধার ভেতর দিয়ে আজ নারীরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জায়গা করে নিয়েছে। এবছর এইচএসসি পরীক্ষায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পাশের হার ও সাফল্য অনেক বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীশিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক, কোথাও এর চেয়ে বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী অধ্যাপকের সংখ্যা পুরুষের প্রায় অর্ধেক।

শ্রদ্ধেয় সুধী

বেগম রোকেয়া অনেক আগে নারীশিক্ষার জন্য যে আলো জ্বালিয়ে গেছেন এখনকার মেয়েরা সেই পথ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ তাদের এই অগ্রযাত্রাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। স্কুল-কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসন-এনজিও–বিমানচালনা-কোর্টকাচারি-ব্যবস্য-বাণিজ্য সর্বত্র নারীরা নিজের যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত। শুধু সরকারের উপর নির্ভর না করে বেসরকারি সাহায্য ও উদ্যোগে মেয়েদের জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির কথাটি কেবল শেøাগান হবে না, সত্যিকারের উন্নয়ন হবে নারীদের । নজরুল বলেছেন– 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।' সম্রাট নেপোলিয়ান বলেছিলেন "আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।" এর থেকে বোঝা যায় নারীশিক্ষা ও নারী উন্নয়ন ছাড়া দেশ ও জাতির সার্বিক মুক্তি অর্জিত হতে পারে না। আপনারা যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনলেন তাদের আবারও শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

'ইভটিজিং প্রতিরোধে ছাত্রসমাজের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে একজন বক্তা হিসেবে একটি ভাষণ রচনা করুন।

আজকের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, শ্রদ্ধাভাজন আলোচকবৃন্দ, প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ, আমন্ত্রিত সুধীসমাজ ও উপস্থিত সকলে– আপনাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আজ একটি অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে আমরা উপস্থিত হয়েছি। প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় নানা বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু আজকের এই সেমিনারটি নানা দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'ইভটিজিং' বা 'যৌন হয়রানি' বর্তমান সময়ের এক জটিল সমস্যা। ইভটিজিংয়ের কারণে প্রায়ই দেশের নানা জায়গায় মেয়ে–ছাত্রী ও নারীরা হয়রানির শিকার হচ্ছে। যৌন হয়রানির কারণে অনেকে আত্মহত্যার মতো পথও বেছে নিচ্ছে। অনেকে স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে রাস্তাঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে কিংবা অন্য কোন জায়গায় পুরুষের দ্বারা নারীর

প্রতি যে কোন যৌন হয়রানিমূলক আচরণকে ইভটিজিং হিসেবে ধরা হয়। সভ্য যুগে প্রবেশ করে আমরা বোধ হয় আদিম অসভ্য সমাজে আবার ফিরে যাবার চেষ্টা করছি। আমাদের চারদিকের পরিবেশ অসুস্থ করে ফেলছে, দম আটকে আসার মতো ঘটনার খবরে আমরা গভীর উদ্বিগ্ন। এই সংকট মোকাবেলায় ছাত্রসমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

সুধীসমাজ

নারীর প্রতি সহিংসতা আর নিপীড়ন নতুন কোন বিষয় নয়। যুগে যুগে তারা অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার। ইভটিজিং তারই বর্তমান ফল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী। মেয়েদের মেধা ও যোগ্যতাকে স্বীকৃতি না দিয়ে তাদের কেবল ভোগের সামগ্রী হিসেবে গণ্য করায় ইভটিজিংয়ের মতো নোংরা ঘটনার জন্ম হয়েছে। বখে যাওয়া ছেলেরা এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটাচ্ছে। তাদের ওপর পরিবারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, মা-বাবার বাধ্য নয় তারা। ইভটিজিংয়ের মতো ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে তারা হয়তো আমাদের বিপথগামী ভাই কিংবা সন্তান, আত্মীয় অথবা পাড়া-প্রতিবেশি স্বজন। ইভটিজিংয়ের সঙ্গে তরুণ-যুবকরা ছাড়াও মধ্যবয়সী বিকৃত রুচির কিছু লোকও জড়িত।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ

ঘরের বন্দিদশা কাটিয়ে মেয়েরা যখন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-অফিস-আদালত ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যাওয়া শুরু করে ইভটিজিংয়ের ঘটনা তখন থেকেই বেশি পরিমাণে ঘটতে শুরু করে। অনেক মূর্খ অশিক্ষিত পুরুষ ইভটিজিংয়ের জন্য মেয়েদের খোলামেলা পোশাককে দায়ী করে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে শালীন রক্ষণশীল পোশাক পরিহিত মেয়েরাও ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। অনেক নারীবাদী সংগঠন এই ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কিন্তু আমরা মনে করি এটা নারীদের একার কোন ব্যাপার নয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে আমাদের সবাইকে। বিশেষ করে ছাত্রসমাজকে এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। তারা পাড়ায় পাড়ায় মহলøায় মহলøায় গিয়ে পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচারণা চালাতে পারে। সরকারকেও এ কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সচেতনতামূলক কবিতা, গান, পোস্টার প্রদর্শনী, ডক্যুমেন্টারি, জারি গান ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে ছাত্ররা তৈরি করতে পারে ব্যাপক সচেতনতা।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ

ইভটিজিং বর্তমানে একটি মারাত্মক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এর হাত থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায় আমাদের সেই উপায়ই বের করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনিকে কঠোর হতে হবে এর প্রতিরোধে। এর পাশাপাশি ইভটিজারদের আমরা বয়কট করে চলবো। তারা কেন এধরনের আচরণ করে সরকারকেও তার কারণ খুঁজে দেখতে হবে। তাদের ভালো পথে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকারেরও একটি নৈতিক দায় রয়েছে।

প্রিয় সুধীজন

সময় এসেছে আমাদের নারীদের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হবার। পরিবার থেকেই এই শিক্ষা শুরু করতে হবে। কোন মৌলবাদী ধর্মান্ধ ফতোয়া দিয়ে যাতে নারীদের হেয় করা না হয় সেদিকে সরকারের বিভাগগুলোর খেয়াল রাখতে হবে। বেশি বেশি করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চর্চা করতে হবে। খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও সৃষ্টিশীল নানা কাজের সঙ্গে তরুণ সমাজকে সংযুক্ত করতে হবে। বেকার সমস্যা সমাধানেরও কোনো বিকল্প নেই। কাজের সুযোগ থাকলে এই ধরনের নোংরা ঘটনা কমে আসবে। আমাকে এরকম একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়ে আমাকে আপনারা সম্মানিত করেছেন। তাই আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কথা এখানেই শেষ করলাম। ভালো থাকবেন সবাই।

‘দুর্নীতি : উন্নয়নের বাধা’ শিরোনামে প্রধান অতিথির একটি ভাষণ রচনা করুন।

আজকের এই সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, বিশেষ অতিথি, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলি– আপনাদের প্রতি রইল আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

সুধীজন

আজ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সভায় আমরা মিলিত হয়েছি। কারণ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন এবং আমরা কমবেশি সবাই যার শিকার সে বিষয়টি হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি যেভাবে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে এবং যেভাবে মানুষকে গ্রাস করছে তা

খুবই চিন্তার কারণ। পরপর কয়েকবার বাংলাদেশ বিশ্বে এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এটি আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক। বাংলাদেশ স্বাধীন একটি দেশ কিন্তু দুর্নীতি আমাদের সুনাম ক্ষুণ্ন করে চলেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য সর্বত্র দুর্নীতি মহামারির আকার ধারণ করেছে। এর ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের সব সম্ভাবনা।

প্রিয় সুধীবৃন্দ

দুর্নীতি বর্তমানে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতিবাজের সংখ্যা কম হলেও তার ফল ভোগ করতে হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে। সরকারি অফিসগুলো হচ্ছে দুর্নীতির আখড়া। ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান, সরকারি কর্মচারিকে অপরাধে সহায়তা করা, অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল নথিপত্র তৈরি, জালিয়াতি করে সম্পত্তি আত্মসাৎ, নথি জাল করা, হিসাব বিকৃত করা দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা স্বার্থ উদ্ধার করাই হলো দুর্নীতি। নানা কারণে আমাদের সমাজে দুর্নীতি বেড়েই চলেছে। এটি একদিনে ঘটেনি। সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সৎ ও স্বচ্ছ হতে হয়। দুর্নীতি বাড়ার পেছনে একটি বড় কারণ হলো রাজনৈতিক প্রভাব। রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে এবং নিজের ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত এই অরাজকতা চলছে। ত্যাগের চেয়ে ভোগের দিকে সবার লক্ষ্য। বড়লোক হবার জন্য বিকৃত প্রতিযোগিতা, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি দুর্নীতির অন্যতম কারণ। দারিদ্রের কারণেও মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। এদেশের মানুষ ধর্মের প্রতি আগ্রহী হলেও অনেক সময় বাধ্য হয়ে দুর্নীতি করে। অভাব-অনটন ও দারিদ্রের কারণে যেমন অনেকে দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তেমনি লোভ ও অতিরিক্ত বড়লোক হবার আশায়ও অনেকে লাগামহীনভাবে দুর্নীতি করে থাকে।

দুর্নীতি একটি রাষ্ট্রের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। বিদেশি সরকার ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য দিলেও তার বেশিরভাগ টাকা লুটপাট হয়। সে কারণে বিদেশিরা সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক বাদবিচার করে এবং নানারকম শর্ত আরোপ করে। শিক্ষা-চিকিৎসা-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে বিদেশি সাহায্য প্রচুর পরিমাণে আসে। কিন্তু তারপরও এক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নয়ন নেই।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ

দুর্নীতি হলো অক্টোপাশের মতো। এখন সময়ের দাবি এই দুর্নীতির হাত থেকে নিজে রক্ষা পাওয়া এবং অন্যকে রক্ষা করা। দুর্নীতি কমাতে না পারলে অন্য দেশগুলোও আমাদের উন্নয়নে সাহায্য করতে চাইবে না। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যা দুর্নীতি। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব না এই দুর্নীতি দূর করা। এর জন্য দরকার আইনের শাসন এবং ব্যাপক সামাজিক উদ্যোগ। কিন্তু রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া আইনের প্রয়োগ করা যায় না। দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব থাকলে দুর্নীতি দূর করা যাবে না। সরকারি প্রভাব খাটালে দুর্নীতিবাজরা উৎসাহিত হবে। মানুষের জীবনমানের দিকে লক্ষ রেখে বেতন বৃদ্ধি, দ্রব্যমূলের দাম ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, জনসচেতনতা সৃষ্টি করে সামাজিকভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ছালিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশন যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারে তবে সেটা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বাংলাদেশে বেশিরভাগ দুর্নীতি হয়ে থাকে। অতএব রাজনৈতিকভাবে দুর্নীতি মোকাবিলা করতে হবে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যদি স্পষ্টভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া না হয় তবে একা দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে এই ব্যাধি নির্মূল করা সম্ভব না। এক্ষেত্রে মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, আলোচনা, কথিকা, নাটক প্রভৃতি প্রচার করে মানুষকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত। এর পাশাপাশি পারিবারিকভাবে নৈতিক শিক্ষার উপরও জোর দো দরকার। অতিরিক্ত ভোগ-লালসা-চাহিদা থেকে বিরত থাকার জন্য নৈতিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

সচেতন সুধীসমাজ

এ দেশ আমাদের সবার। কেউ খাবে কেউ খাবে না এরকমটি এদেশে আমরা হতে দিতে পারি না। আমাদের নবীন প্রজন্মকে সুখী ও নিরাপদ রাখতে আসুন আমরা সবাই দুর্নীতর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করি। দুর্নীতি দূর হলে দেশ উন্নত

হবে, শক্তিশালী হবে, মানুষের কল্যাণ হবে। এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। ভাষণ কী ? ভাষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২। সার্থক ভাষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ উলেøখ করুন।

৩। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে ভাষণ রচনা করুন :

ক) ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বিষয়ক একটি ভাষণ তৈরি করুন।

খ) যুবসমাজের অবক্ষয় প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে একটি ভাষণ রচনা করুন।

গ) 'বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বিষয়ে একটি ভাষণ তৈরি করুন।

পাঠ ৮.১১ : প্রতিবেদন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রতিবেদন কী সে সম্পর্কে করতে পাবেন।
- প্রতিবেদন রচনার বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

ইংরেজি রিপোর্ট (Report) শব্দটির বাংলা পরিভাষা হলো প্রতিবেদন। রিপোর্ট শব্দটির অর্থ বিবরণ, বিবৃতি। কোনো তথ্য, ঘটনা বা বক্তব্য সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দেয়ার নাম প্রতিবেদন। প্রতিবেদন যিনি রচনা বা তৈরি করেন তাকে বলা হয় প্রতিবেদক বা রিপোর্টার। প্রতিবেদককে সাধারণত কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তথ্য, উপাত্ত, সিদ্ধান্ত, মূল্যায়ন, ফলাফল ইত্যাদি অনুসন্ধানের পর কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করতে হয়। সংবাদপত্রে প্রতিদিন এরকম অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এধরনের প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নিজস্ব চিন্তাধারা বা মূল্যায়ন প্রকাশ করার কোনো সুযোগ নেই। তবে অন্যান্য প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নিজস্ব ধারণা, চিন্তা ও মূল্যায়ন থাকতে পারে। সেই কারণে অনেকে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিবেদনের পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন।

প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য

১। কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করতে হবে।
২। প্রতিবেদনে তথ্য ও বস্তুনিষ্ঠতা থাকতে হবে।
৩। প্রতিবেদন হবে সহজ, সরল ও যুক্তিপূর্ণ। পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে প্রতিবেদন রচনা করা যাবে না।
৪। আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রতিবেদন রচনা করা ঠিক নয়।
৫। প্রতিবেদনের বিষয়টি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে রচনা করা যেতে পারে।
৬। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই প্রতিবেদনে প্রধানভাবে আলোচিত হবে।

প্রতিবেদনের নমুনা

'পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষমেলা' সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	জীবনের জন্য বৃক্ষ
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
তারিখ	:	২০–৮-২০১৬
সংযুক্তি	:	বৃক্ষরোপণের ছবি (৩টি)

জীবনের জন্য বৃক্ষ

বৃক্ষ প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি ছাড়া পৃথিবী ও মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের জীবনের অপরিহার্য উপাদান বৃক্ষ। মানবজীবনের এমন কোনো দিন নেই বা মুহূর্ত নেই যে, বৃক্ষ ছাড়া মানুষ চলতে পারে। কারণ বৃক্ষ থেকেই নির্গত হয় অক্সিজেন এবং এই অক্সিজেন ছাড়া মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাসের কথা চিন্তাই করতে পারে না। পরিবেশের অন্যতম উপাদান বৃক্ষ ও গাছপালা।

বাংলাদেশে খুব দ্রুত নগরায়ণ ঘটছে। ফলে গাছপালা ও বনভূমির পরিমাণ কমে আসছে। পরিবেশবিজ্ঞানীরা বলেন যে, কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে মোট ভূমির শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে এই বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১৬ ভাগ। উত্তরবঙ্গে এই বনভূমির পরিমাণ আরও কম। ফলে একধরনের দীর্ঘ মেয়াদি খরা ও মরুকরণের শঙ্কায় আছে আমাদের দেশ। যেভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গাছপালা কেটে নেয়া হচ্ছে তার মারাত্মক প্রভাব পড়েছে পরিবেশের ওপর। বৃক্ষের প্রতি মানুষ যদি সদয় ও যত্নবান না হয় তবে সামনে আরও বিপদ রয়েছে। বিশ্বের বনভূমি উজাড় হতে হতে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। গাছপালার অভাবে প্রকৃতিতে দেখা দিচ্ছে ভূমিক্ষয়, বৃষ্টিহীনতা, ঊষরতা। ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আমাদের জনসংখ্যা। এই বাড়তি মানুষের চাপে বনভূমির পরিমাণ দ্রুত কমে যাচ্ছে। যেখানে তিনটি গাছ কাটা হচ্ছে সেখানে লাগানো হচ্ছে একটি গাছ। দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ নেমে এসেছে ৩.৫ শতাংশে। এরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম আর রাত্রিবেলা থাকে কনকনে ঠাণ্ডা। বৃক্ষ শুধু প্রকৃতির ভারসাম্যই রক্ষা করে না, গ্রামের অর্থনীতিকে চাঙা করেও তোলে। বাংলাদেশে প্রথম ১৯৭৬ সালে সরকারি উদ্যোগে গাছ লাগিয়ে বনাঞ্চল তৈরির কর্মসূচি নেয়া হয়। ১০-১৫ একর জমি নিয়ে কৃত্রিম বন সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়।

বৃক্ষের প্রতি মানুষকে আগ্রহী ও মনোযোগী করে তোলার জন্য প্রতিবছর ১৩ জুন সারাদেশে 'বৃক্ষরোপণ অভিযান' সরকারি কর্মসূচি হিসেবে পালিত হচ্ছে। প্রতিটি জেলা ও থানা সদরে কয়েকদিন ব্যাপী বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয় এবং নানা স্থানে আনুষ্ঠানিকভাবে গাছ রোপণ করা হয়। সবাইকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্নরকম পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা হয়েছে। 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার' দেয়া হয় এজন্য। এর ফলে একধরনের সামাজিক সচেতনতা তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এখন পুরস্কার হিসেবে বৃক্ষচারাও দেয়া হয়। বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থাগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাস্তার দুপাশে এবং পরিত্যক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে তারা প্রচুর বৃক্ষরোপণ করছে। এইসব বৃক্ষরাজি কেবল চারদিকের শোভাই বৃদ্ধি করেনি, পরিবেশ রক্ষার্থেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি নানাভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা চলছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অসাধু বনকর্মকর্তা এবং স্থানীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তির কারণে প্রচুর বৃক্ষ লোপাটও হয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকজন অসাধু বন কর্মকর্তা বৃক্ষনিধনে সহায়তা ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ায় শাস্তির মুখোমুখি হয়েছেন। রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে রাস্তার পাশের বহু গাছ রাতের আঁধারে কেটে বিক্রি করে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। এদের বিরুদ্ধে যদি এখনই ব্যবস্থা না নেয়া যায় তবে পরিণতি খুব ভয়াবহ হতে পারে। প্রতিটি নাগরিকের বৃক্ষরোপণ অভিযানে শরিক হওয়া উচিত। কারণ বৃক্ষই জীবন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ শুধু অরণ্য সংরক্ষণ নয়, অরণ্য সম্প্রসারণেরও কাজ চলছে। তাই বৃক্ষরোপণ শুধু প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসাই নয়, মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্যও এক বিরাট প্রয়াস।

'বাংলাদেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	বাংলাদেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
তারিখ	:	২০-৮-২০১৬

বাংলাদেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষার মূল্য অর্থ দিয়ে করা যায় না। শিক্ষার কারণেই মানুষ ও পশুতে পার্থক্য তৈরি হয়। মানবসভ্যতা শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। মাটিতে কেবল বীজ ছড়িয়ে দিলেই হয় না, সেই বীজ থেকে সবুজ পাতা সৃষ্টিতে দরকার হয় উর্বর মাটি, জল ও প্রয়োজনীয় আলো। তেমনি একটি মানবশিশু জন্ম নিলেই হবে না, তাকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দরকার উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচর্যা। বর্তমান বিশ্ব হলো প্রতিযোগিতামূলক। তাই বর্তমান প্রজন্মকে কেবল শিক্ষা দিলেই হবে না, তাকে সুশিক্ষায় মানবসম্পদে পরিণত করতে

হবে। মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করার প্রধান উপায় হলো শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা সেই বৃহত্তর শিক্ষার প্রথম সোপান। জাতীয় শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো প্রাথমিক শিক্ষা। ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত হলো প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক হওয়ায় একে 'সার্বজনীন শিক্ষা' বলা হয়।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বেশ নাজুক। শিক্ষার মানের অবনতি পীড়াদায়ক। আগের তুলনায় শিক্ষার হার বাড়লেও তা যথেষ্ট নয়। বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষ দেশের জন্য বোঝাস্বরূপ। তাদের চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণাও পুরোনো। তারা আধুনিক জীবন-জগৎ সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু জ্ঞান রাখে না। ফলে সাধারণ শিক্ষার অভাবে এই জনগোষ্ঠী দেশ ও জাতির কোন কাজে লাগে না। তারা রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে প্রায় দেড়শ বছর আগে থেকে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এই সংবিধানে শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯৭৪ সালের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। রাজনৈতিক কারণে এই প্রস্তাবও বাস্তবায়ন করা যায়নি। ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তারপরও প্রায় সাত কোটি মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমাতে না পারলে আমাদের সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে। গত বছরগুলোতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি ছিল। জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে। ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে শিক্ষার সুফল লাভে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে নানা বাধা-বিপত্তি রয়েছে। দারিদ্র্য তার মধ্যে বড় একটি কারণ। গরিব মা-বাবারা তাদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠিয়ে কাজেকর্মে পাঠাতে বেশি আগ্রহী। সন্তান টাকা রোজগার করে সংসারে সাহায্য করবে এই হলো তাদের মনোভাব। লেখাপড়া শেখাকে তারা সময়ের অপচয় বলে মনে করে। সেজন্য দারিদ্র হ্রাস পাবার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের একটি সম্পর্ক রয়েছে। এশিয়ার বহু দেশে শিক্ষার হার অনেক বেশি। শ্রীলঙ্কা, জাপান ও রাশিয়ায় এই সংখ্যা প্রায় শত ভাগ। সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর করে প্রাথমিক শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেই হবে। তা নাহলে উন্নয়ন সঠিকভাবে হবে না। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার ও সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাকে সবশ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে দেশ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি।

'নগর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা' সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	নগর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
তারিখ	:	২০-৮-২০১৬
সংযুক্তি	:	

নগর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। প্রায় ৬৮হাজার গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের এই দেশ। কিন্তু ধীরে ধীরে নগরায়ণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। গত শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশে নগরায়ণ দ্রুত গতিতে শুরু হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় মানুষ নগর ও শহরে বাস করতে থাকে। বাংলাদেশে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা বেশি দিনের নয়। ১৯৬৫ সালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম থেকেই এই অধিদপ্তর ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখছে।

নগরায়ণের ফলে অনিবার্য কিছু সমস্যা দেখা যায়। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন ও অপরাধপ্রবণতা সাগরিক জীবনে নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। নগরে বসবাসকারী মানুষ সবাই ধনী নয়, অনেক গরিব লোকজনও নগরে বাস করে। গ্রামের আর্থিক উন্নতি না ঘটলে নগরের উন্নয়ন ঘটে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ নগরের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল। পরিবহন সমস্যা, যানজট সমস্যা, সড়ক দুর্ঘটনা নগরবাসীর জন্য চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। নগরজীবনে নানারকম সেবা পাওয়া যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেবা পাবার ক্ষেত্রে বহু বৈষম্য দেখা যায়। নগরে অনেক গরিব লোক বাস করে। বস্তিগুলোতে

অনেক গরিব লোক ঠাঁই নিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকায় মানুষের জীবনযাত্রায় মারাত্মক প্রভাব পড়ে। নারী ও শিশু নির্যাতন, ছিনতাই ইত্যাদি নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নগরবাসীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। বায়ু, পানি ও শব্দদূষণ তীব্র আকার ধারণ করায় জনজীবন যেমন অসহ্য হয়ে উঠেছে তেমনি অসাধু ব্যক্তিরা উন্মুক্ত স্থান, পার্ক ও উদ্যান, লেক, নদী, জলাশয় প্রভৃতি দখল করে নেয়ায় নগরের পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। তাছাড়া দখলদারদের হাত থেকে পাহাড়, বনবনানীও রেহাই পাচ্ছে না। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। বর্তমান সময়ে এসে নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা খুব গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি গ্রাম হলেও নগরজীবন আমাদের উন্নয়নের সূতিকাগার। সে লক্ষ্যেই বর্তমানে সরকার শহর ও নগরগুলোর বিকেন্দ্রিকরণের কথা ভাবছেন। নগরায়ণের ভালো দিকগুলো চিহ্নিত করে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। নগর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা আজ ব্যাপকভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। সেজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন আগে করতে হবে। বিভিন্ন সংস্থা, সুশীল সমাজ, নাগরিক প্রতিনিধির সহযোগিতায় পরিকল্পিত নগরায়ণের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সেজন্য নগরের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। মহানগর, মাঝারি শহর এবং ছোট শহরগুলোকে এই উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আমরা জানি, কাজের সন্ধানে প্রতিদিন রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে অনেক গরিব মানুষ ভিড় করে। এর ফলে নগরে বাড়তি চাপ পড়ে এবং মানুষের জীবন নানাভাবে বিপন্ন হয়। সেইজন্য নগরায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে শহরমুখী মানুষের এই স্রোত বন্ধ করা যায়। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে জনগণকে যুক্ত করতে হবে উন্নয়নের সঙ্গে এবং লক্ষ রাখতে হবে যাতে বিনিয়োগ বাড়ে। বিনিয়োগ বাড়লে নগরের শিল্পায়ন হবে এবং মানুষের কাজ ও আয় বাড়বে, দারিদ্র্য কমবে। দারিদ্র্য দূর হলে জীবনযাত্রার মান বাড়বে।

আবাসিক এলাকার সঙ্গে অফিস ও বাণিজ্যিক এলাকা তৈরি করা , গতিশীল পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং রাজধানী ঢাকা ও চট্রগ্রামের দিকে জনস্রোত হ্রাস করা অপরিহার্য। নগরে আবাসন তৈরির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সড়ক পথের উন্নয়ন করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি নগর উন্নয়নের জন্য পরিবেশের ক্ষতি করে এমন সব কার্যক্রম বন্ধ করে ভূমি সংরক্ষণ করতে হবে। এই নগর উন্নয়নের সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্মুক্ত স্থানসমূহ রক্ষা করা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, পাহাড়ি জেলাগুলোতে পাহাড়, টিলা রক্ষা করা, শহরের নিকটবর্তী অঞ্চল বা শহরতলি এলাকাকে অপরিকল্পিত উন্নয়ন থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে নগরায়ণজনিত সমস্যা সমাধান করা যায়।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল একটি দেশ। বাংলাদেশ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট ২০২১ পরিকল্পনাকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে। দেশের সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য নগরায়ণের কোন বিকল্প নেই। পলিøর মানুষ ও কৃষির উন্নতির সাথে সাথে পরিকল্পিত নগরায়ণ না হলে সত্যিকারের জীবনমানের উন্নয়ন অর্জিত হবে বলে মনে হয় না। অতএব এখনি দরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, দরকার তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

'সুখী কমলগঞ্জ কলেজের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা' সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	কলেজের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
তারিখ	:	২০-৮-২০১৬

সুখী কমলগঞ্জ কলেজের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সুখী কমলগঞ্জ কলেজের সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গত ৬ মে থেকে ১২ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সুখী কমলগঞ্জ কলেজটি এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পড়াশুনোর পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধুলায় এই কলেজের সুনাম দীর্ঘদিনের। জাতীয় পর্যায়েও এই কলেজটি পুরস্কৃত হয়েছে ইতোমধ্যে। স্বনামধন্য সুখী কমলগঞ্জ কলেজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সবার আগ্রহ ও মনোযোগ দাবি করে প্রতিবছর।

অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে সুখী কমলগঞ্জ কলেজের সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক হিসেবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ছাত্র সংসদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এছাড়াও সংস্কৃতিমনা অন্য কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী এই

আয়োজনকে সফল করে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে গেছে। সপ্তাহ ধরে চলা এই প্রতিযোগিতাটি ছিল উন্নত রুচি ও মূল্যবোধের পরিচায়ক।

সুদক্ষ অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনও করেন তিনি। বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যাতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে সেজন্য অনেক রকম বিষয়কে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বরচিত কবিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, নির্ধারিত বক্তৃতা, বিতর্ক, পুথিপাঠ, গল্প বলা, প্রবন্ধ রচনা, স্বরচিত গল্প-কবিতা, সুন্দর হস্তাক্ষর, একক অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত, পলিøগীতি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, লালনগীতি, আধুনিক গান, ছড়া গান, নৃত্য, কৌতুক, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনেকজন করে প্রতিযোগী এতে অংশ নেয়, যার ফলে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় প্রতিটি শাখায়। শিক্ষকবৃন্দ আগ্রহ নিয়ে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এবং উপভোগ করেন সমগ্র অনুষ্ঠানটি। বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছে অডিটোরিয়াম ভর্তি শিক্ষার্থীর সরব উপস্থিতি। যারা অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি, দর্শক হিসেবে উপস্থিত থেকে তারা অনুষ্ঠানকে মাতিয়ে রাখে। স্কাউট ও রোভার দলের সদস্যরা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়।

প্রতিযোগিতার শেষ দিনে এলাকার সম্মানিত সংসদ সদস্য প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সবার উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। কলেজের এই সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রধান অতিথি মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করে আরও বেশি বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখার পক্ষে মত দেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় আরও মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন এবং কলেজের উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। শিক্ষা যেমন আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী করে তোলে তেমনি সংস্কৃতিচর্চা শিক্ষার্থীদের সুকুমার বৃত্তিকে বিকশিত করে তুলবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সপ্তাহব্যাপী প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থান বিজয়ীদের মধ্যে মূল্যবান বই ও স্মারক প্রদান করা হয়। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুনন্দা অধিকারী পাঁচটি বিষয়ে বিজয়ী হয়ে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার কৃতিত্ব অর্জন করে। এই সাফল্যের জন্য তাকে বিশেষ পুরস্কার একটি ল্যাপটপ প্রদান করা হয়।

সুখী কমলগঞ্জ কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয় প্রতিযোগিতায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। পুরো আয়োজনের জন্য অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রচেষ্টা ও আগ্রহের ভূয়সীপ্রশংসা করা হয়। বিপুল সংখ্যক অভিভাবক সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তারা অকুণ্ঠচিত্তে এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন। অভিভাবকদের জন্যও কয়েকটি প্রতিযোগিতা নির্ধারিত ছিল। তাতে অনেক অভিভাবক অংশ নেন এবং তাদের মধ্যে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। সাত দিনব্যাপী দারুণ উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে।

বন্যার পর তোমার এলাকার গৃহীত পুনর্বাসন কাজ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	বন্যার পর তোমার এলাকার গৃহীত পুনর্বাসন কাজ
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
তারিখ	:	২০-৮-২০১৬
সংযুক্তি	:	

বন্যাকবলিত চিলমারি উপজেলার পুনর্বাসন

উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকা চিলমারি। মঙ্গা আর দারিদ্র্যের ছবি এখানকার নিষ্ঠুর বাস্তবতা। কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলটি মাত্র গত মাসেই ভয়াবহ বন্যার কবলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। অবিরল বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে চিলমারি উপজেলাটি স্মরণকালের প্রচণ্ড বন্যায় তছনছ হয়ে যায়। একই সময়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলাও বন্যার কবলে পড়ে। হঠাৎ এই বন্যায় চিলমারি উপজেলাটি যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা অবর্ণনীয়। বন্যায় কেবল মানুষই মারা যায়নি বা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়নি, কৃষি ফসল এবং গবাদি পশুরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

প্রায় মাসব্যাপী এই বন্যায় সমগ্র চিলমারি উপজেলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। টানা বর্ষণ এবং সীমান্তের ওপার থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে একদিনেই পাল্টে যায় এলাকার চিরচেনা চিত্র। নিচু এলাকার ঘরবাড়ি তলিয়ে যায় পানিতে, জমির ফসল ভেসে যায়, গবাদি পশুর জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে। উপজেলার যেদিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে বাঁধে-স্কুল-কলেজে এবং শহরের পরিত্যক্ত ভবনে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেয়। গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি নিয়ে বিপাকে পড়ে মানুষজন। খাবারের অভাবে অনেক পশু দুর্বল হয়ে পড়ে, পানিতে ভেসে যায় কোন কোনটি। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-সরকারি প্রতিষ্ঠান-বাজার-দোকানপাট এমনকি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনেও পানি ওঠে। স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। সরকারি সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটায়।

বন্যার পানি প্রায় দুই সপ্তাহ পরে নেমে যেতে শুরু করে। বর্তমানে এখানে পুনর্বাসন কাজ শুরু হয়েছে এবং সরকারি নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ চলছে। ভেঙে যাওয়া রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় সংস্কার করা হচ্ছে। এতে করে বেকার লোকেরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। গরিব-অসহায় মানুষদের মধ্যে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে। কৃষিজমির ফসল পানিতে ভেসে যাওয়ায় তারা পথে বসতে বসেছে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক প্রদান করা হচ্ছে। সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করবেন বলে সরকার ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন এবং অগ্রাধিকারভিত্তিতে তা বাস্তবায়নের নির্দেশও দেয়া হয়েছে। গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণেও অর্থ বণ্টন করা হয়েছে। সরকারের এই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। কিন্তু মহৎ এই উদ্যোগ সত্ত্বেও অনেক মানুষই বঞ্চিত হয়েছে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে। অসাধু দুর্নীতিবাজ স্থানীয় কিছু মানুষের জন্য সত্যিকারের অনেক গরিব লোক এবং বানভাসি মানুষ সাহায্য পায়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, ব্রিজ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি মেরামতের জন্য সরকারি অনুমোদন দেয়া হয় এই উপজেলার জন্য।

বন্যা পরবর্তী সময়ে এলাকায় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। চিলমারিতে সে ধরনের কিছু রোগবালাই দেখা গেলেও তা যাতে মহামারির আকারে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ওষুধপত্র প্রস্তুত রাখা, ডাক্তারদের ছুটি বাতিল করাসহ এনজিও প্রশিকা, ব্র্যাক ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাগুলো সার্বক্ষণিকভাবে স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান করায় প্রাণহানির কোন ঘটনা এখানে ঘটেনি। বিভিন্ন প্রকারের ওষুধ সরবরাহ করা এবং আক্রান্ত রোগীদের ব্যবস্থাপত্র দেয়ার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বন্যা-পরবর্তী কৃষি কার্যক্রম যাতে চালিয়ে নেয়া যায় এবং ক্ষতি হয়ে যাওয়া ফসলের কারণে যাতে খাদ্যাভাব দেখা না দেয় সেজন্য আগাম প্রস্তুত থাকতে কৃষিদপ্তরকে ইতোমধ্যেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বীজতলা তৈরি করে কৃষকদের মধ্যে বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে দেশের ব্যাপক অঞ্চল বন্যায় পøাবিত হবার কারণে সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা বেশ কঠিন। বন্যায় মানুষের যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করা খুব কঠিন। তারপরও এসব সামান্য সাহায্য-সহযোগিতা বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে মানুষকে সাহস জোগায়, তাদের টিকে থাকার লড়াইয়ে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে সব এলাকার প্রতিই সরকারকে নজর দিতে হয়। তারপরেও চিলমারি এলাকার পুনর্বাসন কাজে সরকারের সহযোগিতা ও তৎপরতা প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। যেকোনো প্রাকৃতিক সংকটে সরকারের পাশাপাশি দেশের জনসাধারণকেও পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। প্রতিবেদন বলতে কী বুঝায় ? সার্থক প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিবেদন রচনা করুন :

ক) কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রতিবেদন খ) লোডশেডিং সম্পর্কে প্রতিবেদন

গ) যানজট সমস্যা সম্পর্কে প্রতিবেদন

পাঠ ৮.১২ : বৈদ্যুতিন চিঠি ও খুদেবার্তা লিখন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বৈদ্যুতিন চিঠি লিখার পদ্ধতি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- খুদেবার্তা লিখার নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ই-মেইল বা বৈদ্যুতিন চিঠি ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিনির্ভর পত্র-যোগাযোগের মাধ্যম। এ প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক, দাপ্তরিক বা যে কোনো ধরনের বার্তা, চিঠি, প্রতিবেদন, তথ্য-উপাত্ত, নথি, ভিডিও ইত্যাদি প্রেরণ করা যায়। এর জন্য দরকার ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার এবং gmail, yahoo, hotmail এসব ওয়েবসাইটের যে কোনোটিতে একটি একাউন্ট। একটি ই-মেইল একই সঙ্গে অসংখ্য মানুষের কাছে পাঠানো সম্ভব।

বৈদ্যুতিন চিঠির নিয়ম-কানুন :

১. To লিখিত বক্সে প্রাপকের ঠিকানা লিখতে হয়। অন্য কাউকে বৈদ্যুতিন চিঠি সম্পর্কে অবগত করতে Cc বক্সে সংশিøষ্ট ব্যক্তির ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে।

২. Subject বক্সে সংক্ষেপে বিষয় উলেøখ করতে হবে।

৩. Text অংশে মূল বিষয় সংক্ষেপে, সংহতভাবে ও সহজবোধ্যরূপে উলেøখ করতে হবে। একাধিক বিষয় থাকলে ক্রমিক নম্বর অনুসারে বিষয়গুলোকে সাজিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

৪. বৈদ্যুতিন চিঠিতে সাধারণ চিঠির মতোই প্রয়োজনানুসারে সম্বোধন করতে হয়।

৫. নথি, ফাইল, ভিডিও ইত্যাদি প্রেরণের জন্য Attatchment অংশের সাহায্য নিতে হবে।

৬. সবশেষে Send -এ Click করে বৈদ্যুতিন চিঠি প্রেরণ করতে হবে।

বৈদ্যুতিন চিঠির কতিপয় নমুনা :

১. জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লিখুন।

To	pjmina@yahoo.com
Cc	
Bcc	
Subject	জন্মদিনের শুভেচ্ছা।
Text : প্রিয় মিনা, আজ তোমার ২৪তম জন্মদিন। এ শুভদিনে তোমার প্রতি অশেষ শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। তোমার জীবন সাফল্যে ও আনন্দে ভরে উঠুক তোমার জন্মদিনে আমার এ অকৃত্রিম কামনা। শুভেচ্ছান্তে হেনা	

২. পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের সংবাদ জানিয়ে পরীক্ষার্থীদের প্রতি বৈদ্যুতিন চিঠি লিখুন।

To	Sajid1990@yahoo.com, jhsakib_175@gmail.com, younus@email.com, k.saz_bd@hotmail.com, tafiq75@yahoo.com
Cc	
Bcc	
Subject	পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন।
Text : প্রিয় শিক্ষার্থীরা, অনিবার্য কারণে তোমাদের আগামীকাল **১৬/০২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার** অনার্স ২য় বর্ষের টিউটরিয়াল পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে না। পরীক্ষাটি ১৮/০২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শনিবার একই সময়ে একই কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সহপাঠীদের সংবাদটি জানিয়ে দিও। শুভেচ্ছাসহ তোমাদের কোর্স শিক্ষক হাসান কবীর	

৩. খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে ছোট ভাইকে বৈদ্যুতিন চিঠি লিখুন।

To	rumel_1995@yahoo.com
Cc	
Bcc	
Subject	খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন হও।
Text : স্নেহের রুমেল, তোমার শারীরিক অসুস্থতার কথা জেনে উদ্বিগ্ন আছি। ইদানিং প্রায়শই তুমি অসুস্থতায় ভুগছ। মনে হচ্ছে খাবারের বিষয়ে তুমি অনিয়ম করছ। হোস্টেলে খাবারের যে ব্যবস্থা তা পর্যাপ্ত ও সুষম হওয়ার কথা নয়। এছাড়া সঠিক সময়ে খাবার গ্রহণের বিষয়েও তোমার অবহেলা আছে বলে মনে হচ্ছে। মনে রাখবে, সুষম খাবার আর সঠিক খাদ্যাভ্যাসই সুস্থ থাকার উত্তম উপায়। দুধ ও ডিম নিয়মিত খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। কাচা খাওয়া যায় এমন সবজি প্রতিদিন খাবে। ভাল লেখাপড়া করে উন্নত জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়েই তুমি আমাদের থেকে দূরে আছ। কিন্তু শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ না থাকলে তোমার স্বপ্ন পূরণ বাধাগ্রস্ত হবে। তাই খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে সচেতন ও যত্নশীল হবে। তোমার মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি। শুভেচ্ছাসহ তোমার প্রিয় বড় বোন মিতু	

৪. বিবাহের নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লিখুন।

To	h.reza@yahoo.com
Cc	
Bcc	
Subject	বিবাহের নিমন্ত্রণ।
Text : প্রিয় রেজা, আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আগামী ২৮/০৬/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার আমার বড় ভাই সাজিদ কবীরের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে তোমার আনন্দময় উপস্থিতি গভীরভাবে কামনা করছি। আশা করছি, তোমার ব্যস্ততা সত্ত্বেও যথাসময়ে আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। শুভেচ্ছাসহ জিহান	

৫. বই সরবরাহের তাগিদ দিয়ে প্রকাশককে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লিখুন।

To	mollikbrothers@yahoo.com
Cc	
Bcc	
Subject	বই সরবরাহের তাগাদাপত্র।
Text : জনাব, বাংলা বিভাগের সেমিনারে জরুরি ভিত্তিতে সরবরাহের জন্য গত ১২ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বইয়ের তালিকাসহ আপনার কাছে একটি ই-মেইল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাইনি। আশা করছি , জরুরি বিবেচনা করে দ্রুত বই পাঠিয়ে তা ফিরতি ই-মেইলে আমাকে অবগত করবেন। ধন্যবাদান্তে মুনীরা কবীর,বিভাগীয় প্রধান,বাংলা বিভাগ ..... কলেজ, ... ।	

পাঠ ৮.১৩ : পত্র লিখন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পত্র কী ও কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার পত্ররচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

মূলপাঠ

দূরবর্তী লোকের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে চিঠিপত্র। এটি একটি পরোক্ষ যোগাযোগ মাধ্যম। চিঠিপত্রে সংবাদ আদান-প্রদানের বৈষয়িক প্রয়োজন যেমন সিদ্ধ হয়, তেমনি রচনার গুণে আর লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে চিঠি, বিশেষত ব্যক্তিগত চিঠি কখনো কখনো সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে। চিঠিপত্রে লেখকের জ্ঞান ও রুচিবোধের পরিচয় মেলে। চিঠিপত্র রচনার সূত্রপাত প্রাচীন কালেই। তবে চিঠিপত্র প্রেরণের যে বিশ্বব্যাপী ডাকব্যবস্থা তা নিতান্তই হাল আমলের।

সাধারণভাবে চিঠিপত্র চার ধরনের –

১. ব্যক্তিগত পত্র
২. সামাজিক পত্র
৩. ব্যবহারিক বা বৈষয়িক পত্র
৪. বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক পত্র

একেক ধরনের চিঠির কাঠামো একেক রকমের, তবে প্রতিটি ধরনের রয়েছে সুনির্দিষ্ট কাঠামো এবং ভাষাভঙ্গিও প্রায় নির্দিষ্ট। কেবল ব্যক্তিগত পত্রে লেখক নিজস্ব ধরনে চিঠি রচনার স্বাধীনতা ভোগ করেন।

চিঠি লেখার কিছু সাধারণ নিয়ম–

১. চিঠির ভাষা হবে আকর্ষণীয়, প্রাঞ্জল ও সহজে বোধগম্য।
২. শুদ্ধ বানানে, সঠিক বাক্যে ও সুন্দর হস্তাক্ষরে চিঠি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. চিঠি মূল বক্তব্যকে ঘিরে লিখিত হবে; বাহুল্য বা অতিরঞ্জন পরিত্যাজ্য।
৪. কাঠামো মেনে চিঠি রচনা করতে হবে এবং খামে প্রেরক ও প্রাপকের পূর্ণ ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৫. পত্রিকায় প্রকাশের চিঠির দুটো অংশ– একটি মূল চিঠি, অপরটি সম্পাদকের প্রতি ছাপানোর অনুরোধ।
৬. স্মারকলিপিতে সব সময় 'আপনি' সম্বোধন ব্যবহার করতে হয়।

১. ব্যক্তিগত পত্র :

সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের তাগিদে মানুষ আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-স্বজন বা পরিচিতজনের কাছে চিঠি লিখে থাকেন। এই ধরনের ব্যক্তিগত ভাবনা তাড়িত চিঠিই ব্যক্তিগত চিঠি হিসেবে চিহ্নিত।

প্রচলিত কাঠামোতে ব্যক্তিগত চিঠির পাঁচটি অংশ। সেগুলো হচ্ছে––

(১) ঠিকানা ও তারিখ
(২) সম্ভাষণ
(৩) মূলপত্র
(৪) বিদায় সম্ভাষণ
(৫) স্বাক্ষর

(১) ঠিকানা ও তারিখ : পত্রের বামদিকের ওপরের অংশে প্রথমে পত্রলেখকের পূর্ণ ঠিকানা ও তার নিচে তারিখ লিখতে হয়। যেমন :

৫০/১, নর্থ রোড
ঢাকা-১২০৫
১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ **অথবা,**
গ্রাম- ভুরবুড়িয়া
ডাক- পুটিয়া বাজার
জেলা- নরসিংদী
২৬ আগষ্ট, ২০১৬খ্রি.

(২) সম্ভাষণ : যাকে উদ্দেশ্য করে চিঠিটি লেখা হচ্ছে তার সম্মান, মর্যাদা ও পত্রলেখকের সঙ্গে তার সম্পর্কের নিরিখে সম্ভাষণসূচক শব্দ ব্যবহার করতে হয়। আর সম্ভাষণ লিখতে হয় পত্রের বামদিকে ঠিকানার পরের ধাপে। যেমন :

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু/শ্রদ্ধেয় আব্বা/প্রিয় সুলতান/স্নেহাস্পদ রাসেল/সুজনেষু ইত্যাদি।

(৩) মূলপত্র : এটিই চিঠির মূল অংশ। এ অংশে পত্রলেখক তার বক্তব্যকে সুন্দর করে গুছিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করবে। একই পত্রে একাধিক বক্তব্য থাকলে তা আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে লিখতে হবে।

(৪) বিদায় সম্ভাষণ : মূলপত্রের পরের ধাপে পত্রের বামদিকে বিদায় সম্ভাষণ লিখতে হয়। পত্রপ্রাপকের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে বিদায় সম্ভাষণসূচক শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যেমন :

ইতি, আপনার স্নেহাস্পদ/ স্নেহধন্য
ইতি, প্রীতিমুগ্ধ/ প্রিয় বান্ধব
ইতি, তোমার মঙ্গলপ্রার্থী
ইতি, বিনীত ইত্যাদি।

(৫) স্বাক্ষর : এটি চিঠির শেষ অংশ। এখানে পত্রলেখকের পুরো নাম বা প্রচলিত মুদ্রাকৃতি ব্যবহার করা যায়।

চিঠি প্রাপকের কাছে পৌঁছলেই এর সার্থকতা। প্রাপকের কাছে পৌঁছানোর জন্য খাম ব্যবহার করতে হয় এবং খামের ডানদিকে প্রাপকের ও বামদিকে প্রেরকের পূর্ণ ঠিকানা লিখতে হয়। নিম্নে একটি চিঠির পূর্ণ কাঠামো উপস্থাপিত হলো –

(১) তারিখ ও ঠিকানা
(২) সম্ভাষণ
(৩) মূলপত্র
(৪) বিদায় সম্ভাষণ
(৫) স্বাক্ষর

স্ট্যাম্প

প্রেরক,	প্রাপক,
নাম	নাম
ঠিকানা	ঠিকানা

ব্যক্তিগত পত্রের কতিপয় নমুনা উপস্থাপিত হলো –

পত্র ১. জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে ছোট ভাইকে একটি পত্র লিখুন।

৮ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি.
মনোহরপুর, কুমিলøা

প্রিয় আরিয়ান,
আমার স্নেহের পরশ নিও। আজই সকালে তোমার চিঠি পেয়েছি। ভালো আছ জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। আর অশেষ আনন্দে পুলকিত হয়েছি এসএসসি পরীক্ষায় তোমার জিপিএ ৫ পাওয়ার সংবাদে। ভালো ফল অর্জনের জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।
ভালো ফল তোমার সামনে এক অবারিত দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। এখন তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করার পালা। মনে রেখো, লক্ষ্য স্থির না থাকলে তোমার মেধা ও সামর্থ্যের সঙ্গে জীবনের প্রকৃত সফলতার মেলবন্ধন হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। বড় কোনো লক্ষ্য সামনে স্থির করা থাকলেই কেবল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্যম তোমার মধ্যে তৈরি হবে। আরেকটি কথা স্মরণে রেখো, মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। নিজের লক্ষ্যকে কখনো ছোট করো না, তাতে নিজের শক্তির উপর নিজেরই অবিচার করা হবে। কী হতে চাও সে লক্ষ্য ঠিক করে তার পেছনে এখনি ছুটতে শুরু করো, ঝাঁপিয়ে পড় লক্ষ্য অর্জনের মিশনে। আর তাতেই তোমার জীবন সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত হবে, নিজেকে খুঁজে পাবে সফল মানুষদের কাতারে।
পরবর্তী পত্রে তোমার লক্ষ্যের কথা জানিও। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিও। আমরা সবাই ভালো আছি। তুমি ভালো থেকো।
ইতি

তোমার নিত্য শুভার্থী
ঊর্মি

স্ট্যাম্প

প্রেরক, ঊর্মি ৪৮, মহিলা কলেজ রোড মনোহরপুর, কুমিলøা।	প্রাপক, আরিয়ান ইউসুফ ৩৬৪, সেন্ট্রাল রোড ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

পত্র ২. কোথাও বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে পিতার কাছে পত্র লিখুন।

১৭ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.
ঢাকা কলেজ, ঢাকা

পরম শ্রদ্ধেয় বাবা
আমার সালাম নিবেন। আশা করি সবাই মিলে ভালো আছেন। গতকাল আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষাও আশানুরূপ হয়েছে, ভালো ফল অর্জন করতে পারব বলে আশা করছি। কয়েক দিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করব। পরীক্ষার কারণে শরীর ও মনের ওপর অনেক ক্লান্তি জমা হয়েছে। কোথাও একটু বেড়াতে যেতে পারলে এই ক্লান্তি দূর হতো। ইতোমধ্যে আমার বন্ধুরা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামি ২৫ মে তারিখে তিন দিনের সফরে তারা রওনা হবে। পৃথিবীর বৃহত্তম ও আশ্চর্য সুন্দর এই সমুদ্র-উপকূলে বেড়ানো আমার দীর্ঘদিনের শখ।
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়ানোর সুযোগটি আমি হাতছাড়া করতে চাই না। আপনার অনুমতি পেলেই আমার এই ইচ্ছাটি পূরণ হবে। আশা করি পরবর্তী পত্রে শীঘ্রই অনুমতি পাব। অনুমতি দিলে খরচ বাবদ ১০০০ টাকা পাঠাবেন। আমি ভালো আছি। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিবেন। সোহানকে আমার শুভেচ্ছা ও মাকে আমার সালাম জানাবেন।
পুনশ্চ, কক্সবাজার থেকে ফিরেই কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে বেড়াতে আসব।
ইতি

আপনার স্নেহের
কমল

স্ট্যাম্প

প্রেরক,
কমল
২০৪, নর্থ হোস্টেল
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

প্রাপক,
আবু কায়সার শিকদার
গ্রাম ও পোষ্ট – আদিয়াবাদ
জেলা – নরসিংদী।

পত্র ৩. নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

পহেলা বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
আজিমপুর, ঢাকা

সুপ্রিয় পরশ,
আজ শুভ বাংলা নববর্ষ, বাঙালি জাতির জীবনে এক পরম আনন্দের দিন। একরাশ পরম ভাল-লাগা আর নতুনের বার্তা নিয়ে আমাদের জীবনে ঘটেছে আজকের সূর্যোদয়। বাংলা নববর্ষের এই শুভ লগ্নে তোমাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। অতীতের সকল ব্যর্থতা আর গøানি ঘুচে যাক, নতুন বছরটি হোক তোমার জন্য সাফল্য-রঙিন, নববর্ষের প্রথম প্রহরে তোমার প্রতি রইল এই শুভ কামনা।

মঙ্গল পরিপূর্ণ হোক তোমার সারাটি বছর।

তোমার সুহৃদ

নোহাশ

স্ট্যাম্প

প্রেরক, নোহাশ ২৬৪, পশ্চিম নাখালপাড়া তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।	প্রাপক, কবীর আহমদ পরশ ৩৮৭/১ পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী উপজেলা মোড়, নরসিংদী।

২. সামাজিক পত্র :

সামাজিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে যেসব চিঠি লিখিত হয়, সেগুলোকেই সামাজিক পত্র বলা হয়।

সামাজিক পত্রের কয়েকটি নমুনা :

পত্র ৪. বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র (হিন্দু রীতি)।

শ্রীশ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ

মহাত্মন,

প্রণামপূর্বক নিবেদন এই, আগামী ২৬ জানুয়ারি,২০১৭ খ্রি./ ১৩ মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার হাজীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামলকান্তি রায়ের সঙ্গে আমার একমাত্র কন্যা শুকলা রায়ের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হবে। উক্ত দিবসে আমার নিজ বাড়িতে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে সপরিবারে উপস্থিত থেকে শুভ কাজে যোগদান ও মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন।

পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ প্রদানের ত্রুটি মার্জনা করবেন।

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
২রা মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

বিনয়াবনত
হরেন্দ্রলাল রায়

স্ট্যাম্প

প্রেরক,
হরেন্দ্রলাল রায়
ভুলতা, রূপগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ ।

প্রাপক,
পুলক কুমার সাহা
২২/৩ চাষাঢ়া, নারায়ণগঞ্জ।

পত্র ৫: আপনার কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানের একটি নিমন্ত্রণ পত্র লিখুন।

নবীন বরণ অনুষ্ঠান–২০১৭

সুধী,

আগামী ২০ বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/৩ মে, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শনিবার কুমিলøা সরকারী মহিলা কলেজে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত একাদশ শ্রেণি, ডিগ্রি (পাস) ১ম বর্ষ, অনার্স ১ম বর্ষ ও মাস্টার্স ১ম পর্ব শ্রেণির ছাত্রীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি. মহোদয় উপস্থিত থাকবেন বলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার/ আপনাদের উপস্থিতি কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে
প্রফেসর রুহুল আমিন ভূঁইয়া
অধ্যক্ষ, কুমিলøা সরকারী মহিলা কলেজ, কুমিলøা।

অনুষ্ঠানসূচি :
১ম পর্ব :

১০:০০ - প্রধান অতিথিকে গার্ড অব অনার প্রদান
১০:১৫ - অতিথিদের মঞ্চে আসন গ্রহণ
১০:২০ - পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা পাঠ
১০:৩০ - অতিথিদের বরণ
১০:৩৫ - স্বাগত ভাষণ
১০:৪০ - নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ
১০:৫০ - অতিথিবৃন্দের বক্তব্য

২য় পর্ব :

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

[বি. দ্র. খাম সংযুক্ত করতে হবে।]

পত্র ৬. আপনার কলেজে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি নিমন্ত্রণ পত্র লিখুন।

সুধী,
আগামী ২৫ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ(৮ মে, ২০১৭ খ্রি.) সোমবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলেজ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা, রবীন্দ্র-রচনা থেকে পাঠ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবে বিশিষ্ট রবীন্দ্র-গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন।

এ অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করছি।

বিনীত
কাশফিয়া মুনজেরিন
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
কলেজ ছাত্রসংসদ
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।

১৫ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

অনুষ্ঠানসূচি :
১ম পর্ব :

১০:০০ - প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ
১০:০৫ - আলোচনা
১২:০০ - রবীন্দ্র-রচনাবলি থেকে পাঠ
১২:৩০ - রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন
০১:৩০ - অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা।

[বি. দ্র. খাম সংযুক্ত করতে হবে।]

৩. ব্যবহারিক বা বৈষয়িক পত্র :

অফিসের কাজে এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে সংবাদপত্রে লেখা চিঠি এ শ্রেণিভুক্ত।

কতিপয় নমুনা দেওয়া হলো–

পত্র ৭. হিসাব সহকারী পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লিখুন।

তারিখ : ১৭ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দেশ-বাংলা গ্রুপ
৪৭, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

বিষয় : . হিসাব সহকারী পদে নিয়োগের আবেদন।

জনাব
সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ১১ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. তারিখের 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম, আপনার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কিছু সংখ্যক শিক্ষানবীশ হিসাব সহকারী নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করলাম।

১. নাম : সানজিদা শাহনাজ
২. মাতার নাম : ফেরদৌস আরা
৩. পিতার নাম : মোঃ দৌলত হোসেন
৪. জন্ম তারিখ : ৫ মার্চ, ১৯৯৩ খ্রি.
৫. ধর্ম : ইসলাম
৬. জাতীয়তা : বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে)
৭. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- হাসনাবাদ, ডাকঘর - হাসনাবাদ, উপজেলা- রায়পুরা, জেলা- নরসিংদী।
৮. বর্তমান ঠিকানা : ২১, নাজিম উদ্দীন রোড, ঢাকা- ১১০০।
৯. শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষা	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	ফলাফল	বছর
এস.এস.সি	ঢাকা	জি.পি.এ. ৩.২০	২০০৮
এইচ.এস.সি	ঢাকা	জি.পি.এ. ৩.০৫	২০১০
বি.বি.এস (অনার্স)	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	জি.পি.এ. ২.৭৩	২০১৫

অতএব, মহোদয় সমীপে নিবেদন উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে আমাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের হিসাব সহকারী পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
সানজিদা শাহনাজ
সংযুক্তি :

১. সদ্য তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
২. সকল পরীক্ষার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. এককপি চারিত্রিক সনদ।
৪. নাগরিক সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

পত্র ৮. ছুটির আবেদনপত্র।

তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রি.

বরাবর
অধ্যক্ষ
লোহাগড়া আদর্শ সরকারি কলেজ, নড়াইল।

বিষয় : দুই দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন।

জনাব
বিনীত নিবেদন এই যে, বিশেষ পারিবারিক প্রয়োজনে আমার ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ খ্রি. তারিখ সোম ও মঙ্গলবার এই দুদিন ছুটি প্রয়োজন।

অনুগ্রহপূর্বক কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতিসহ উক্ত দুদিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

জোনায়েদ আহম্মেদ
প্রভাষক, বাংলা
লোহাগড়া আদর্শ সরকারি কলেজ, নড়াইল।

পত্র ৯. বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লিখুন।

সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক
১ নং আর.কে. মিশনরোড, ঢাকা।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত চিঠিটি ছাপিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত

কাজী আলাওল
গ্রাম– সৈয়দ নগর
ডাকঘর – ঘোষগ্রাম
জেলা – দিনাজপুর।

বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। জনভারে এদেশের প্রকৃতি বিপর্যস্ত। মানুষের বিপুল জ্বালানি ও আসবাবপত্রের চাহিদার কারণে বন কেটে উজাড় করা হচ্ছে। পাহাড় ও বনভুমি কেটে আবাদী জমিতে পরিণত করা হচ্ছে, সেখানে বাড়িঘর বানানো হচ্ছে। ফলত বৃক্ষহীন হয়ে যাচ্ছে এদেশ, যার পরিণাম ভয়াবহ। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে এদেশ দিন দিন মরুময়তার দিকে এগোচ্ছে। যা কখনোই কাম্য হতে পারে না।

ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকতে হয়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে আছে মাত্র ৭ থেকে ৮ শতাংশ। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সারাদেশ জুড়ে বৃক্ষনিধন রোধের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য দেশের প্রত্যেককে জীবন ও পরিবেশের জন্য বৃক্ষের গুরুত্ব বোঝাতে হবে এবং সকলকে বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে প্রতি বছর পয়লা জুলাই থেকে সাতই জুলাই পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে সরকারের এ প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু ভয়াবহতার তুলনায় সরকারের এ প্রচেষ্টা খুবই অপ্রতুল। এখন দরকার ব্যক্তিগত ও বেসরকারী পর্যায়ের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর উদ্যোগে গড়ে তুলতে হবে বৃক্ষরোপণ আন্দোলন। প্রত্যেকের বাড়িতে ও প্রতিটি পরিত্যক্ত জায়গায় বৃক্ষরোপণ করে বাংলাদেশকে বৃক্ষের সবুজে পরিপূর্ণ করতে হবে। তবেই আমরা প্রাণের প্রাচুর্যে বাঁচব, বাঁচবে বাংলাদেশ।

বিনীত
কাজী আলাওল
গ্রাম– সৈয়দ নগর
ডাকঘর – ঘোষগ্রাম
জেলা – দিনাজপুর।

পত্র ১০. কলেজের নবীনদের বরণ উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা করুন।

ঢাকা কলেজের একাদশ শ্রেণির নবাগত শিক্ষার্থীদের
বরণপত্র

তারিখ: ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

হে স্বপ্নসারথী
সীমাহীন সবুজাভ স্বপ্ন ও অফুরন্ত বর্ণিল সম্ভাবনা সত্তার শেকড়ে ধারণ করে তোমরা প্রবেশ করেছ প্রথিতযশা বিদ্যায়তন ঢাকা কলেজের পবিত্র অঙ্গনে। জ্ঞান সাধনার এই আলোকিত ভূবনে তোমাদের উষ্ণ স্বাগতম ও প্রাণঢালা অভিবাদন।

হে জ্ঞানার্থী
জ্ঞানসাধনার এক উর্বর তীর্থভূমি ঢাকা কলেজ। এই কলেজের অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিভিন্ন অঙ্গনে রেখেছে তাদের অসামান্য প্রতিভার ছাপ; নিজেরা আলোকিত হয়েছে; আলোকিত করেছে দেশ, জাতি ও বিশ্বকে; এতদ্‌সঙ্গে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে ঢাকা কলেজের সম্মান। তোমরা সেই জ্যোতির্ময় অগ্রজদের উত্তরসূরি; তাদের হাতের ঝাণ্ডা আজ তোমাদের হাতে সমর্পিত, যোগ্যতম অনুজের মতোই সেই ঝাণ্ডা বহন করে নিয়ে যাবে সম্ভাবনার দূরলোকে– এটাই তোমাদের কাছে আজ প্রাণের দাবি।

হে ভবিষ্যতের কাণ্ডারি
তোমরা বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী–এটা অবশ্যই তোমাদের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই সৌভাগ্য তখনই চূড়ান্ত সার্থকতা পাবে, যখন তোমরা কলেজের সকল শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে, আন্তরিক নিষ্ঠায় করবে জ্ঞানের সাধনা । তোমরা এ দেশের ভবিষ্যতের কাণ্ডারি। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সকল অঙ্গনের নেতৃত্বভার তোমাদেরকেই বহন করতে হবে। বিচক্ষণ প্রশাসন, প্রাজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলি ও দক্ষ কর্মচারীদের সমন্বয়ে ঢাকা কলেজে বিদ্যমান রয়েছে শিক্ষার এক আদর্শ পরিবেশ। এই চির সবুজের ক্যাম্পাসে মেধা আর মননশীলতা চর্চার মাধ্যমে তোমাদের প্রতিভা শতদল শতপুষ্পে বিকশিত হোক, হিরণ্ময় হোক তোমাদের জ্ঞান-অভিযাত্রা। তোমাদের যোগ্যতম নেতৃত্ব, মেধা, প্রতিভা আর সাধনার কর্ষণে সমৃদ্ধ হোক এ জনপদ।

হে আলোর অভিসারী

আলোর সঙ্গেই যেমন মিশে থাকে অন্ধকার, তেমনি মাদকসেবন, ইভটিজিং, জুয়াখেলা, বখাটেদের সঙ্গে আড্ডা এমনি বহু প্রতিভানাশী, আত্মঘাতী প্রলোভন ওৎ পেতে আছে সর্বত্র। তোমাদেরকে সতর্ক হতে হবে সেই সব প্রলোভন সম্পর্কে, মুক্ত থাকতে হবে সেই সব মোহ থেকে। স্বীয় বিবেক ও বিচার-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। মনে রাখতে হবে, তোমরা বড় হয়েছ; নিজের অভিভাবকত্ব এখন নিজেকেই করতে হবে, এখন নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় পাহারাদার । কবির ভাষায় :

"এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।"

তোমরা যুবক, তোমরা তরুণ। তোমাদেরকে এখন যুদ্ধ করতে হবে শত প্রলোভনের বিরুদ্ধে, নিজের ভেতরকার রিপুর বিরুদ্ধে, প্রতিভা-বিকাশের সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। তোমাদেরকে এখন লড়াই করতে এমন একটি জীবন অর্জনের জন্য যে জীবন হবে বিভাময়, সাফল্যে মোড়ানো, মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত, দেশপ্রেমে উচ্চকিত ও সর্বজনীন কল্যাণবোধে প্রাণিত।

ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

পত্র ১১. আপনার এলাকার উন্নয়নের আবশ্যকীয়তা বর্ণণা করে মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি রচনা করুন।

তারিখ : ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
লে. কর্ণেল (অবঃ) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (বীর প্রতীক) এম. পি. সমীপে

শ্রদ্ধা-স্মারক

হে নরসিংদীর সূর্য-সন্তান

মেঘনা-শীতলক্ষা-হাড়িধোয়া- ব্রহ্মপুত্রের পলি বিধৌত প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ নরসিংদী জেলার উর্বর মাটির কোলে জন্ম নিয়েছে কীর্তিধন্য অগণিত সন্তান। আপনি সেই সূর্য-সন্তানদের অন্যতম চূড়ামণি; স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা, শ্রম আর অধ্যবসায়ে সফল হয়েছেন নিজে, গর্বিত করেছেন নরসিংদীবাসীকে।

হে মুক্তির জ্যোতির্ময় বীর সেনানী

পরাধীনতার ঘন অন্ধকারভেদী বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যোদয়ে আপনি এক পরাক্রমশালী বীর মুক্তিযোদ্ধা। ঔপনিবেশিক শাসনে, পেষণে এই দেশের মানুষ যখন দিশেহারা, মুক্তির জন্য আপামর বাঙালি যখন মরীয়া, তখনই বাঙালির মুক্তির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অবিনাশী ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিরাপদ চাকুরির মায়া বিসর্জন দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন; জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে এনেছেন পরম কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছেন মুক্তির সৌরভ। মুক্তিযুদ্ধে আপনার অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্র আপনাকে ভূষিত করেছে 'বীর প্রতীক' খেতাবে। আমরা আপনার সম্মানে প্রণতি জানাই।

হে আদর্শ রাজনীতিবিদ

আপনি ছিলেন দেশপ্রেমে নিবেদিত একজন অত্যন্ত চৌকষ সেনাকর্মকর্তা। সেনাবাহিনীর গৌরবময় চাকুরি থেকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে আপনি অবসর নিয়েছেন, কিন্তু অবসর নেননি দেশপ্রেমের অকৃত্রিম ব্রত থেকে; নিজেকে জড়িয়েছেন দেশের সেবা করার আরো বিস্তৃত ও প্রসারিত অঙ্গনে––রাজনীতিতে। আপনি সুস্থ ধারার প্রগতিশীল ও উন্নয়নমুখী রাজনীতির এক আদর্শ কাণ্ডারি; বর্তমান বিবদমান ও সংঘাতময় রাজনীতির পটভূমিতে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। জনগণের সরাসরি ভোটে পর পর দুই বার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন যা আপনার প্রতি জনগণের এক অফুরন্ত ভালবাসা ও আস্থারই প্রতিফলন। জনগণের মতো আপনার ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন জননেত্রী ও গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আপনাকে নিযুক্ত করেছেন তাঁর মন্ত্রিসভার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে। আপনার এ অর্জন আমাদের জন্য গৌরবের, অধিকন্তু সৌভাগ্যের।

হে উন্নয়নের রূপকার

উন্নয়নের একটি রূপকল্প নিয়েই আপনি রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছেন। নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সেই রূপকল্পকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার। জনদরদী বন্ধু হিসেবে আপনি রাস্তা -ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার-হাট, কৃষকের মাঠ, শিল্প-কারখানা – সর্বত্র আপনি সরকারের উন্নয়নকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। আপনার নতুন দায়িত্ব আমাদেরকে বিশেষভাবে আশান্বিত করে তুলেছে; কারণ আমরা প্রমত্ত মেঘনার তীরবর্তী নদীভাঙন কবলিত জনপদের বাসিন্দা। নদী-ভাঙনে প্রতি বছর আমাদের ব্যাপক জীবন ও সম্পদহানি ঘটে থাকে। ফসল, জমি ও ঘরবাড়ি হারিয়ে আমাদের নিঃস্ব হওয়ার ইতিহাস সুপ্রাচীন। নদীর বুকে হারিয়ে গেছে আমাদের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, রাস্তা, ঘাট। নদীর প্রমত্ত স্রোতের কারণে এতদঞ্চলে কোনো পাকা রাস্তা, সেতু গড়ে ওঠেনি। মন্থর নৌপথই আমাদের একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে একুশ শতকের পৃথিবীতেও আমরা কার্যত গৃহবন্দী। বর্তমানে আপনি শুধু আমাদের প্রতিনিধিই নন, আপনি পুরো দেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কর্ণধার। আমাদের গভীর আশা, আপনার নতুন দায়িত্ব আমাদের ভাগ্য খুলে দেবে, আমাদের জীবনে বয়ে আনবে সৌভাগ্যের সোনালি বার্তা। আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ কোনো কিছুই আপনার অজানা নয়। তবু আমাদের ভাগ্যোন্নয়নের কিছু জোর দাবি নিয়ে আপনার দরবারে আমরা হাজির হয়েছি।

১. মেঘনার ভাঙন কবলিত এলাকাগুলোতে দ্রুত বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করে আমাদের জীবন, সম্পদ রক্ষার কার্যকর উদ্যোগ নেবেন।
২. সড়ক যোগাযোগের উন্নয়নের জন্য পাকা রাস্তা ও সেতু, বিশেষ করে নরসিংদী জেলা শহরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য মেঘনা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করবেন।
৩. আমরা বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত; আমাদের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন।
৪. আমাদের চরাঞ্চলের মানুষের জন্য একটি আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবেন। এ অঞ্চলে বিভিন্ন ধাপের কিছু উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আপনি কাজ করে যাচ্ছেন বাংলাদেশের একটি সমস্যাপীড়িত জনপদকে দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত, সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে; আমাদের দাবিগুলো আপনার কর্মসূচিরই অংশ মাত্র।

হে স্বপ্নসাধক

আধুনিক সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন নিয়ে আপনার কর্ম-প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তা অম্লান হোক, দীঘায়ু হোক আপনার স্বপ্ন, দীর্ঘায়ু হোন আপনি।

গুণমুগ্ধ এলাকাবাসী
নরসিংদী সদর, নরসিংদী।

পত্র ১২. কোনো বিশিষ্ট শিল্পপতির উদ্দেশ্যে মানপত্র রচনা করুন।

বিশিষ্ট শিল্পপতি, দানবীর, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী
জনাব আবদুল বাছির মোল্লা-র
নরসিংদী সরকারি কলেজ আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শুভাগমন উপলক্ষে

সম্মাননাপত্র

তারিখ; ০৩ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

হে ধ্রুপদী আলোর অভিযাত্রী

বৈশাখের তপ্ত দাবদাহের তৃষাতুর বুকে বর্ষার মেঘমেদুর শীতলতার ন্যায় সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা পুষ্প-পত্রে সুশোভিত নরসিংদী সরকারী কলেজ ক্যাম্পাসে আপনার শুভাগমন আমাদেরকে করেছে সজীব, প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত; আপনার পদস্পর্শে আজ এ পবিত্র অঙ্গন হয়ে উঠেছে আনন্দমুখর। খুশির ফল্গুধারায় স্নাত এদিন আমাদের জন্য এক শুভ সূচনার বার্তাবহ স্মরণীয় দিন। আমাদের মাঝে আপনার মতো শিক্ষা-দরদি ও জ্ঞানপূজারিকে পেয়ে আমরা গর্বিত ও ধন্য। আপনি আমাদের আনন্দিত হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ করুন।

হে কীর্তিমান সুধী

আপনি বর্তমান বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ও বরেণ্য শিল্পোদ্যোক্তা। স্বপ্নসম্ভব সাফল্যের এক অধীশ্বর আপনি; পরাভব না-মানা এক সর্বজয়ী সত্তা; সাফল্যগাথার এক রূপদক্ষ শিল্পী; সংগ্রামী মানুষদের জন্য এক আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। জন্মেছিলেন প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে মমতাময়ী মায়ের কোলে, জীবন-বাস্তবতার সঙ্গে লড়ে-যুঝেই তিলে তিলে বড় হয়েছেন। স্বীয় প্রজ্ঞা আর সাধনায় আপনি নিজ হাতে গড়ে নিয়েছেন আপন ভাগ্য; সামান্যের সমতল থেকে যাত্রা করে অসামান্য পারঙ্গমতায় আজ আপনি সাফল্যের হিমালয়-উচ্চতাকে স্পর্শ করেছেন। কিন্তু সমতলের কথা আপনি ভুলেননি, সমতলকে ছেড়েও যাননি; নিরুপম মহানুভবতায় সমতললগ্ন থেকে পরম প্রীতি ও ভালবাসায় অবহেলিত ও নিরক্ষর মানুষদের ভাগ্যোন্নয়নে আপনি এক অনলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, যা এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে মানুষ ও মানবতার জন্য।

হে নিবেদিতপ্রাণ কর্মবীর

আমরা অনুভব করি, জ্ঞানে ও সম্পদে সমৃদ্ধ ও আলোকদীপ্ত জনপদ হিসেবে নরসিংদী জেলাকে গড়ে তোলার জন্য আপনি আপনার দান, ধ্যান ও কর্মকে নিবদ্ধ করেছেন। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এতদঞ্চলের এক ব্যাপক বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করেছে, উন্নত করেছে এককালের হতদরিদ্র মানুষদের জীবনযাত্রা ও জীবনমান। আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য নিশ্চিত করেছেন উন্নত কর্ম-পরিবেশ এবং তাদের সন্তানদের জন্য উন্নত জীবনের স্বপ্ন। সুবিধাবঞ্চিত ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে আলোকিত করার লক্ষে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন অগণিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; নিশ্চিত করেছেন উন্নত শিক্ষা-পরিবেশ ও গুণগত মান। তাছাড়া মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে আপনার মুক্ত হস্তের দান এতদঞ্চলের মানুষের ধর্মচর্চার পরিবেশকে উন্নত করেছে এবং নৈতিকতানিষ্ঠ মানুষ গড়ে তোলায় অসাধারণ প্রভাব রাখছে। মানবিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আপনার আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা একটি উন্নত সমাজ ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে এক সুদূরব্যাপ্ত ভূমিকা রেখে চলেছে – যা এ সমাজে অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। কর্মে, সাধনায় ও সাফল্যে আপনি প্রকৃতই একজন ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব।

হে নন্দিত শিক্ষানুরাগী

নরসিংদী জেলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ নরসিংদী সরকারী কলেজ আপনার সহযোগিতায় ঋদ্ধ হয়েছে বার বার। নরসিংদী সরকারী কলেজ, এর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের প্রতি আপনার রয়েছে অনুপমেয় ভালবাসা। সম্প্রতি আপনার অনুদানে মাটি ভরাটের মাধ্যমে খেলার উপযোগী হয়ে ওঠেছে জলাবদ্ধতায় অকেজো হয়ে থাকা কলেজের খেলার মাঠ। নরসিংদী সরকারী কলেজের প্রতি আপনার আন্তরিকতা ও অনন্য ভালবাসার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনাকে সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই।

হে মান্যবর
আপনি দীর্ঘায়ু লাভ করুন, ধন ও জ্ঞানের অন্বয়ী সাধনায় আপনি যে অসাধারণ জীবনমণ্ডল গড়ে তুলেছেন, তা আরো বিভাময় ও প্রসারিত হোক, আপনি মানুষ ও মানবতার জন্য এক অনশ্বর প্রেরণার উৎস হয়ে বেঁচে থাকুন, প্রত্ন-অক্ষরে লেখা থাকুক আপনার মহত্ত্বের কথা, নশ্বর পৃথিবীতে শত-সহস্র বছর পরেও লোকে লোকে ধ্বনিত হোক আপনার জয়গাঁথা– নরসিংদী সরকারী কলেজ পরিবার আপনার জন্য এই শুভ কামনা করে।

ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
নরসিংদী সরকারি কলেজ, নরসিংদী।

৪. ব্যবসায়িক পত্র :
ব্যবসায়িক লেন-দেন, কোনো দ্রব্যের অর্ডার, চুক্তি– এসব প্রয়োজনে যে সব চিঠি লিখিত হয়, সেগুলো ব্যবসায়িক পত্র হিসেবে পরিগণিত।

ব্যবসায়িক চিঠির নমুনা :

পত্র ১৩. কিছু বই সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে কোনো পুস্তক প্রকাশককে চিঠি লিখুন।

১৭/১২/২০১৩ খ্রি.
গ্রাম–কল্যাণপুর
ডাকঘর – কৃষ্ণপুর
উপজেলা – আজমিরিগঞ্জ
জেলা– নেত্রকোনা

ম্যানেজার
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

জনাব,
জরুরি ভিত্তিতে আপনার প্রকাশনার নিম্নলিখিত বইসমূহ আমার ঠিকানায় ভিপিপি ডাকযোগে পাঠালে বাধিত হবো। সবগুলো বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণ পাঠাবেন।
অগ্রিম হিসেবে ৩০০/– টাকা পাঠানো হলো।

১. আগুনপাখি – হাসান আজিজুল হক ১ কপি
২. সাবিত্রী উপাখ্যান – হাসান আজিজুল হক ১ কপি
৩. ফিরে যাই ফিরে আসি – হাসান আজিজুল হক ১ কপি

আপনার বিশ্বস্ত
আলী হায়দার

স্ট্যাম্প

প্রেরক,
আলী হায়দার
গ্রাম–কল্যাণপুর
ডাকঘর – কৃষ্ণপুর
উপজেলা – আজমিরিগঞ্জ
জেলা– নেত্রকোনা

প্রাপক,
ম্যানেজার
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

নিম্নলিখিত চিঠিগুলো নিজে নিজে অনুশীলন করুন :

ব্যক্তিগত পত্র

১. বন্ধুর পিতৃ-বিয়োগে সান্ত্বনা জানিয়ে চিঠি লিখুন।
২. ছোট ভাইকে পড়াশুনায় মনোযোগী হওয়ার উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখুন।
৩. একুশের বইমেলার বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে চিঠি লিখুন।
৪. জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে পিতার সঙ্গে মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের যুক্তি তুলে ধরে পিতার নিকট পত্র লিখুন।
৫. হোস্টেল জীবনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বড় ভাইকে চিঠি লিখুন।

সামাজিক পত্র

১. জন্মদিন উপলক্ষে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ পত্র লিখুন।
২. কলেজে সরস্বতী পুজা উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি দাওয়াতপত্র রচনা করুন।
৩. একটি সভার আহ্বান পত্র রচনা করুন।

আবেদন পত্র

১. শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষের নিকট আবেদনপত্র লিখুন।
২. সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লিখুন।
৩. আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি চেয়ে পুলিশ সুপারের নিকট আবেদনপত্র রচনা করুন।
৪. রাস্তা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি আবেদন লিখুন।
৫. ইভ-টিজিং নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পত্র লিখুন।

অন্যান্য

১. কলেজ অধ্যক্ষের বিদায় উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা করুন।
২. আপনার এলাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।
৩. কোনো নষ্ট পণ্য ফেরত নেওয়ার তাগিদ দিয়ে সরবরাহকারীকে একটি চিঠি লিখুন।

পাঠ ৮.১৪ : সারাংশ/সারমর্ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সারাংশ ও সারমর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে হবেন।
- সারাংশ ও সারমর্ম রচনার দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
- ছোট আকারে বড় ভাব প্রকাশ করতে পারবেন।
- আবেগবহুল ভাষা বাদ দিয়ে সরাসরি মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।

সারাংশ/সারমর্ম

মানুষের সমাজ জীবনে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা অন্যের সঙ্গে কথা বলি, অন্যকে চিঠিপত্র লিখি। এসবই ভাষার সাহায্যে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা। অথবা বলা যেতে পারে নিজের মনের ভাবনা বা ভাব অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া। একেই বলে ভাবের আদান প্রদান। ভাষা ঠিক এ কাজটিই করে- যাকে আমরা বলতে পারি ভাবের আদান-প্রদান।

ভাব বা ভাবনা সব সময় একরকম হয় না। তাই এর ভাষাও একরকম হয় না। তাছাড়া যা বলছি বা যা লিখছি অবস্থাভেদে তার গভীরতা ও বিস্তৃতি সব সময় সমান হয় না। আমরা কম-বেশি সবাই রেডিও, টিভি শুনি ও দেখি। আপনি নিশ্চয় খেয়াল করে দেখেছেন যখন আমরা সংবাদ শুনি তখন সংবাদের মূল কথাগুলিই মাত্র শুনি। যেমন, ধরা যাক একটি সংবাদ "আজ সকাল ৫টায় চট্টগ্রাম সমুদ্র উপকূলে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। এখন পর্যন্ত হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি।" এ দুবাক্যের সংবাদের উপর যখন সংবাদ ভাষ্য বা বিবরণ প্রকাশ করা হয় তখন কিন্তু অনেক বেশি কথা বলা হয়। যেমন ধরুন ঘুর্ণিঝড় সতর্ক সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে কিনা, ঘুর্ণিঝড় পূর্ব কি কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, উপকূলে কতটা বিস্তৃত অঞ্চলে ঝড়টি আঘাত হেনেছে, আঘাত হানার আগে সারাদিনের আবহাওয়া কেমন ছিল, যে অঞ্চলে আঘাত হেনেছে সেখানে আশ্রয় কেন্দ্র আছে কিনা ইত্যাদি। সংবাদ ও সংবাদভাষ্যের মূল বক্তব্য এক হলেও ভাবপ্রকাশে ভাষার পরিস্থিতি অনেক পার্থক্য আছে। অর্থাৎ জানা গেল প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা বক্তব্যের মূল ভাবকে কখনও ছোট করে উপস্থাপন করি কখনও বিস্তৃত বা বড় করে উপস্থাপন করি। আবার দেখুন আমরা যখন লিখি তখনও ছোট বড়র ব্যাপারটিকে অনুসরণ করি। যেমন ধরুন টেলিগ্রাম ও চিঠির কথা। একই ভাব বা বক্তব্য দুটো মাধ্যমেই পাঠানো যায়। যদি একটি টেলিগ্রাম হয় এরকম মা অসুস্থ, তাড়াতাড়ি এসো। টেলিগ্রামের ঠিক এ বক্তব্যকে যদি আমরা চিঠিতে পুরে পাঠাই তবে অবশ্যই আমরা আরও বিস্তৃত করে লিখি। চিঠিপত্রের আঙ্গিক বা কাঠামো অনুসরণ করেই মূল বক্তব্যের সঙ্গে নিশ্চয় আমরা আরও লিখব – মা কবে থেকে অসুস্থ, কী ধরনের অসুখ, ডাক্তার দেখেছেন, হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে কিনা ইত্যাদি আরও জরুরি বিষয়।

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় জানা গেল – প্রয়োজনমত ভাষাকে আমরা ব্যবহার করি। মূল ভাব বা ভাবনা কখনও সংক্ষিপ্ত করেও কখনও বিস্তৃত করে প্রকাশ করতে পারি। ভাষার অনেক গুণের মধ্যে এটি একটি প্রধান গুণ যে ভাষাকে আমরা সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত দুভাবেই প্রয়োগ করতে পারি। ভাষার এগুণ আমাদের ব্যবহারিক জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

সারাংশে ও ভাবসম্প্রসারণ লিখন প্রকৃতপক্ষে ভাষার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত করে লেখার পদ্ধতির নাম। আগে যেমন আমরা দেখলাম একটি বিষয়কে প্রয়োজন মোতাবেক সংক্ষিপ্ত বা ছোট করে এবং বিস্তৃত বা বড় করে লেখা যায়। সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত বা ছোট করে লেখার নামই সারাংশ আর বিস্তৃত বা বড় করে লেখার নামই ভাবসম্প্রসারণ। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনেই ভাষার এ গুণকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। সঠিকভাবে সারাংশ ও ভাবসম্প্রসারণ লিখনের জন্য আমাদের বিশেষ কতকগুলো দিকে নজর রাখতে হবে।

সারাংশ শব্দের অর্থ 'সার' অংশ বা 'মূল' অংশ। যে কোন একটি লেখা পড়লে আমরা দেখতে পাই, লেখকের মনের মূলভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূল ভাবের সহায়ক অনেক কথা বলতে হয়। একটি ভাবকে যথার্থ ও সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপমা, উদাহরণ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। সে লেখাটির মূল কথা বা সার কথা বা সারবস্তুই আসলে সারাংশ। ইংরেজিতে তিনটি শব্দ আমরা লক্ষ করি Summary, Substance ও Precis এ শব্দগুলোর যথার্থ বাংলা শব্দ নাই। এ শব্দটির সঙ্গে ভাব অনুষঙ্গও এক নয়। এ তিনটি ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সারাংশ নয়। তবে সারাংশ বলতে যে কাজটি বোঝায় তার সঙ্গে ঐ শব্দগুলোর মিল আছে। Summary লিখতে বললে মূল অংশের অর্ধেক, Substance এ মূলের এক তৃতীয়াংশে বা তিন ভাগের এক ভাগ ও Precis মূল অংশের চার ভাগের একভাগ লিখতে হয় Precis এ একটি শিরোনাম ও দিতে হয়। সারাংশ লিখতে আমরা মূল অংশের তিন ভাগের এক ভাগ লেখা উচিত। তবে সারাংশের আকৃতির দিকে যেমন নজর দিতে হবে তেমন নজর দিতে হবে তার প্রকৃতির দিকেও। সারাংশে মূলভাবটি যথার্থ ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করাটাই মূল বিষয়। বাহুল্য কথার মধ্য থেকে মূল কথাটি খুঁজে বের করাই সারাংশ লেখার উদ্দেশ্য।একটি রচনা নানা কারণে দীর্ঘ হতে পারে। বিষয়ের কারণে সেখানে যুক্ত হতে পারে উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্তের বাহুল্য। ঘটনার ঘনঘটাও বিচিত্র নয়।। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় এসব কিছুই হয়ত মানিয়ে যায়। কিন্তু সারাংশ রচনার ক্ষেত্রে এসব বাহুল্য একেবারে পরিতাজ্য। সেখানে অতিরিক্ত অলঙ্কার বাদ দিয়ে সহজ সরল ভাষায় বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। মোট কথা, কোনো লেখা ছোট আকারে আকর্ষণীয় ভাষায় প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম। কবিতার ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্তকরণকে বলা হয় সারমর্ম এবং গদ্যের ক্ষেত্রে একে সারাংশ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

কোনো গদ্য বা কবিতা রচনায় যেসব যুক্তি, দৃষ্টান্ত, উপমা ও অলঙ্কার থাকে তা বাদ দিয়ে সহজ ও সরল ভাষায় বিষয়টি সংক্ষেপে প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম।

সারাংশ বা সারমর্ম লেখার নিয়ম

১. নির্ধারিত অংশটি বার বার পড়ে মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে হবে।

২. মূল অংশে যেসব অপ্রয়োজনীয় উপমা, অলঙ্কার, দৃষ্টান্ত আছে সারাংশে তা বাদ দিয়ে আসল কথাটা লিখতে হবে।

৩. একই কথার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। তেমনি প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেয়া যাবে না।

৪. সারাংশ খুব ছোট কিংবা বড় হবে না। মূল অংশের চেয়ে তা অবশ্যই আকারে ছোট হবে।

৫. বক্তব্যের বর্ণনায় বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, অলঙ্কার, উপমা, রূপক ইত্যাদি অবান্তর। বাহুল্য বাদ দিয়ে মূল বিষয়টি সরাসরি লিখতে হবে।

৬. মূল বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো বিষয় সারাংশে অবতারণা করা যাবে না। অনুমান নির্ভর কোনো ব্যাখ্যা বাঞ্ছনীয় নয়।

৭. সারমর্ম কিংবা সারাংশ রচনার ভাষা মূলের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। সহজ-সরল মৌলিক ভাষায় বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে সবার সহজবোধ্য হয়।

৮. উদ্ধৃত রচনায় একাধিক বিষয় থাকলে তা সংক্ষেপে উলেøখ করতে হবে এবং মূল বিষয়টি থেকে যাতে রচিত অংশটি সরে না আসে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

৯. শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে সংযম অবলম্বন করতে হবে। একাধিক বিশেষণ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়।

১০. কোনো সাংকেতিক বিষয় থাকলে তার তত্ত্ব বের করতে হবে। ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকলে দুই পক্ষের বক্তব্য আলাদাভাবে প্রকাশ করতে হবে।

১১. প্রদত্ত অনুচ্ছেদ অথবা কবিতাংশটি বারবার পড়ে মূলভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

১২. উদ্ধৃত অংশের মূলভাবের বাক্য/বাক্যগুলি চিহ্নিত করুন।

১৩. উপমা, উদাহরণ, উদ্ধৃতি ও রূপক আলাদাভাবে চিহ্নিত করুন।

১৪. সারাংশ লিখনের সময় লেখার আয়তনের দিকে লক্ষ রাখুন।

১৫. মূলভাবটি যথাযথ ও সহজ বাক্যবিন্যাসে লিখুন।

১৬. উপমা, রূপক উদ্ধৃতসহ সকল বাহুল্য বর্জন করুন।

১৭. একই কথার পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে লক্ষ্য করুন।

১৮. উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কবি বা লেখকের সেটি বলার দরকার নেই।

১৯. প্রথম বাক্যটি হবে সহজ সরল ও মূলভাবের প্রতি নির্দেশক।

২০. সারাংশটি লেখা হলে কয়েকবার পড়ে নিশ্চিত হন যে প্রয়োজনীয় কোনো কিছু বাদ যায়নি।

ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। সারাংশ রচনায় ভাষা পড়ে বুঝতে পারা ও সংক্ষিপ্ত করে লেখা এ দুটি বিষয়ের দক্ষতা প্রয়োজন হয়। এ দক্ষতা অর্জন করতে হলে সারাংশ রচনার অনুশীলন করতে হবে।

সারাংশ/সারমর্ম রচনার নমুনা

১.

কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিল পথিকের পায়,
কামড়ের চোটে বিষ দাঁত ফুটে বিষ লেগে গেল তায়।
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার, তারি সাথে হায়, জাগে শিয়রের আগে।
বাপেরে বলে সে ভর্ৎসনা ছলে কপালে রাখিয়া হাত,
"তুমি কেন বাবা ছেড়ে দিলে তারে, তোমার কি নেই দাঁত?"
কষ্টে হাসিয়া আর্ত কহিল, " তুই রে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে বলে কুকুরের পায়ে দংশি কেমন করে?
কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়েছে পায়,
তাই বলে কুকুরে কামড়ানো মানুষে শোভা পায়?"

সারমর্ম : যে অধম ও বিবেকহীন সে অনায়াসেই নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হতে পারে, অন্যের ক্ষতি সে করতে পারে অসঙ্কোচে। বিবেকবান রুচিশীল মানুষ প্রবৃত্তির অবাধ স্রোতে গা ভাসাতে পারে না। বিবেকে, মনুষ্যত্বে ও ক্ষমায় মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখতে হয়।

২.

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কলেøাল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শিকলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা যদি সহসা বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া ভঙ্গ করিয়া একবারে বাহির হইয়া আসে, তবে সে বন্ধন মুক্ত উচ্ছ্বসিত শব্দের স্রোতে দেশ-বিদেশ ভাসিয়া যাইত। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

বিদ্যুৎ মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে। কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ-ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে পুরিয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী রাখিবে। অতলস্পর্শী কালো সমুদ্রের উপর কেবল একখানা বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

সারাংশ : মানবসভ্যতার কোটি কোটি বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ধারণ করে আছে লাইব্রেরি। অভ্রভেদী হিমালয়ের কঠিন বরফ আর পাথুরে শরীরের ভেতরে যেমন করে অসংখ্য বন্যা বাঁধা পড়ে আছে, তেমনি লাইব্রেরির বইয়ের পাতায় নিশ্চুপ শব্দে গ্রথিত হয়ে আছে মানুষের জীবনপ্রবাহের কথামালা। পুস্তক মানুষের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের সেতু রচনা করে দিয়েছে।

৩.

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান,
কণ্টক-মুকুট শোভা; দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী খুরধার
বাণী মোর শাপে তব হল তরবার।
দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই-- হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি, কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক।

সারমর্ম : দারিদ্র্যের কঠিন পীড়নে ধৈর্য, স্থৈর্যের মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনের সত্য-স্বরূপের সন্ধান পায়, লাভ করে অসঙ্কোচে সত্য-প্রকাশের অমিত শক্তি। দারিদ্র্যের দহনে জীবন হয়ে ওঠে শুদ্ধ-শুচি, মহিমান্বিত। আবার দারিদ্র্যের পেষণেই মানুষের জীবনরস নিঃশেষিত হয়। দারিদ্র্য মানুষের বয়ে আনে মরণক্লিষ্ট রিক্ততা; দারিদ্র্যের রুদ্র স্পর্শে মানুষের শতদলে পুষ্পিত হওয়ার শক্তি হয় তিরোহিত।

৪.

বহুদিন ধরে বহুক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

সারমর্ম : প্রকৃতির সৌন্দর্যে অবগাহন করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরায়ত। আর এর জন্য সৌন্দর্য-মুগ্ধ মানুষের মহা আড়ম্বরে দেশ-বিদেশে ছুটাছুটির অন্ত নেই। অথচ ঘরের পাশের প্রকৃতির মধ্যেই লুক্কায়িত আছে অপরিমিত সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য উপভোগের জন্য শুধু প্রয়োজন প্রকৃতি নিহিত সৌন্দর্যের বিমুগ্ধ অন্বেষণ।

৫.

সার্থক জনম মোর জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে।
জানি না তোর ধন রতন আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় বসে।
কোন বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল
কোন বনেতে উঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে।

সারমর্ম : জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের আত্মার বন্ধন; মাতৃভূমির সবকিছুর সঙ্গেই অনুভব করে নিবিড় ভালবাসা। মাতৃভূমির ধন-ভাণ্ডারের সঙ্গে এ ভালবাসার কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পদে রিক্ত হলেও দেশের প্রতি মানুষের ভালবাসার কমতি হয় না। জন্মভূমির আলো-হাওয়া আর প্রকৃতির মমতাময় সান্নিধ্যে মানুষ অনুভব করে সুগভীর প্রশান্তি। জন্মভূমির বুকে জন্ম

নেওয়াকে যেমন সৌভাগ্যের মনে করে এর সন্তানেরা, তেমনি মৃত্যুর পরেও এরা জন্মভূমির কোলে আশ্রয় পেতে গভীর আকুলতা প্রকাশ করে।

৬.

বার্ধক্য তাহাই– যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই– যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন, শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না, যাহারা জীব হইয়াও জড়, যাহারা অটল সংসারের পাষাণস্তূপ আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে; আলোক পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলকে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে। জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে, জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার, বৃদ্ধ তাহারাই। বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কালমূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন।

সারাংশ : বার্ধক্য আসে বয়সে ভর করে নয়, আসে মানস-চেতনার শেকড় ধরে। মনে যখন ভর করে নতুনের প্রতি ভীতি আর পুরাতন জরাজীর্ণতার প্রতি আসক্তি, তখন নবীনের দেহেও দৃশ্যমান হয় বার্ধক্যের কম্পন। আর নতুনকে বুক জুড়ে প্রাণের বন্যায় ধারণ করার শক্তির মধ্য দিয়ে প্রবীণের ন্যুব্জ দেহ যৌবনের তেজে হয়ে ওঠে দীপ্তিময়।

৭.

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মত কেন বলিস?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোরে দিলেন ধাতা আপন হাতে
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কিছু বাড়ল তাতে?
আপনারে যে ভেঙেচুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন নামটা তার কদিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যা রে
খাঁটি ধন যা যেথায় পাবি, আর কোথাও পাবি না রে।

সারমর্ম : প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিকশিত হওয়ার অফুরন্ত সম্ভাবনা। কিন্তু হীনম্মন্যতাজনিত অন্ধ পরানুকরণে মানুষের অমিত শক্তির অপচয় ঘটে। এধরনের মানসিকতা নিদারুণ অপমানের। মানুষ সত্যিকারার্থে মর্যাদাবান হয়ে উঠতে পারে আপন প্রতিভার সযত্ন বিকাশে।

৮.

থাকবো নাক বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে
কিসের নেশায় কেমন মরছে যে বীর লাখে লাখে
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।
কেমন করে পারলে পাথার লক্ষ্মী উঠেন পাতাল ফুঁড়ে
কিসের অভিমানে মানুষ চড়ছে হিমালয়ের চূড়ে
তুহিন মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়?
হাউই চলে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে।

সারমর্ম : অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি ও কর্মোদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মানুষ অসাধ্যকে সাধন করে, দুর্জয়কে করে জয়। মানুষ তার দুর্বার শক্তিতে পরাভূত করে সাফল্যযাত্রার সকল প্রতিবন্ধকতাকে। দুর্মর ইচ্ছা আর কর্মপ্রেরণার যৌগে অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, বিশ্বের অতল রহস্যের উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে মানুষ বিশ্বে তার বিজয়কেতন উড়িয়েছে।

৯.

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই, এমন কি এক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই। এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, সেখানে থেকে তারা একটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে বাকী জীবনআরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণ সাপেক্ষ; অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একবারে ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়–– ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করে দিতে পারেন, তার বুদ্ধিকে জাগ্রত করে দিতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জাগ্রত করে দিতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না।

সারাংশ : শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ; ভূমিকাটি সহায়কের– শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের সন্ধান দান ও বিদ্যার্জনে উদ্দীপ্তকরণে। শিক্ষার্জনে শিক্ষার্থীর ভূমিকাই মুখ্য, শিক্ষার্থীকেই আপন নিষ্ঠায়, পরম ধৈর্যে বিদ্যার সাধনা করতে হয়। শিক্ষার্থীর অন্তর্গত প্রেরণা, উদ্দীপনা ও কর্মপ্রচেষ্টায়ই সম্পন্ন হয়ে থাকে শিক্ষার্জন।

১০.

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র
নানাভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সেসব কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।

সারমর্ম : শিক্ষা কেবল প্রতিষ্ঠানের কাঠামোয় বন্দি নয়; শেখার উপাদান ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। বিশ্বের প্রতিটি ধূলি আর জলকণা, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ ইত্যাকার সবকিছুই জানার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই অবারিত উৎস থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য প্রয়োজন কেবল জ্ঞানান্বেষী দৃষ্টি।

১১.

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সারমর্ম : মানুষ জন্মে একা; কিন্তু তাকে বাঁচতে হয় সমাজে, সবাইকে নিয়ে, পরার্থপরতায়। নিজের সুখে ব্যস্ত থাকার মধ্যে মানুষের জন্য সুখ থাকে না; নির্মল, নিখাঁদ সুখ নিহিত থাকে পরের হিতার্থে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মধ্যে।

১২.

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল
মাঠভরা দেই আমি কত শস্য ফল;
পর্বত দাঁড়ায়ে রহে কি জানি কি কাজ
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ।
বিধাতার অবিচার কেন উঁচু-নিচু
সে কথা আমি নাহি বুঝিতে পারি কিছু।
গিরি কহে সব হলে সমতল পারা,
নামিত কি ঝরনার সুমধুর ধারা?

সারমর্ম : বৈচিত্র্যের মধ্যে সৃষ্টির সচলতা। আপাতদৃষ্টে কোনো কিছুকে নিষ্ক্রিয় মনে হলেও সেও সৃষ্টির চলমানতার নিগূঢ় নিয়মে বাঁধা। সমতলভূমি ফুল-ফল-শস্যে পূর্ণ করে তোলে। পাষাণ পাহাড় সে তুলনায় কিছুই করে না; অথচ তার মর্যাদা রাজাধিরাজের। প্রকৃতপক্ষে পাহাড়ের বুক থেকে ঝরনার সুমধুর ধারার ওপরই নির্ভরশীল সমতলভূমির উৎপাদন-ক্ষমতা।

১৩.

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা

বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

সারমর্ম : জীবনে বিপদ আসে প্রকৃতির নিয়মেই। অসীম ধৈর্যে আর অকুতোভয় সাহসে বিপদকে মোকাবেলার মধ্য দিয়েই মানুষের মানব-মহিমা দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। বিপদে অন্যের অনুকম্পা আর সান্ত্বনা মূল্যহীন।

১৪.

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্য––মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে। পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম।

সারাংশ : মানুষ বিবেক, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনুষ্যত্বের সাধনায় প্রাণিজগতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। শারীরিক শক্তি আর অর্থনৈতিক সামর্থ্য মানুষকে মহত্ত্ব দান করে না, মানুষের মহত্ত্ব তার মনুষ্যত্বে, জগতের কল্যাণ সাধনের সামর্থ্যে, বুদ্ধিবৃদ্ধিক পরিচর্যায় অমরকীর্তি গড়ে তোলার ক্ষমতায়।

১৫.

জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলিয়া থাকেন–– তাহাই সাহিত্য। বাতাসের উপর চিন্তা ও কথা স্থায়ী হইতে পারে না, মানবজাতি তাই অক্ষর আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের মূল্যবান কথা, উৎকৃষ্ট চিন্তাগুলি কোন যুগে পাথরে, কোন যুগে গাছের পাতায এবং বর্তমানে কাগজে লিখিয়া রাখা হইয়া থাকে। যে নিতান্তই হতভাগা, সে-ই সাহিত্যকে অনাদর করিয়া থাকে। সাহিত্যে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার মীমাংসা হয়। তোমার আত্মা হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন হইতে পার না, সাহিত্যকেও তুমি অস্বীকার করিতে পার না– ইহাতে তোমার মৃত্যু– তোমার দুঃখও সমান হয়।

সারাংশ : সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ জীবনানুভূতি যখন লেখকের চেতনারসে মণ্ডিত হয়ে ভাষার অক্ষরে বাণীবদ্ধ রূপ পায়, তখন তা সাহিত্য অভিধা পায়। সাহিত্যের মর্মমূলে নিহিত থাকে কল্যাণ ও সুন্দরের নির্ভেজাল অভিব্যক্তি, মানুষের যাতীয় আকাঙ্ক্ষা। একারণেই মানুষের জীবনে সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৬.

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলেও ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, তুমি দেবভাবে পরিপূর্ণ মনে কর, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ জাগে, একবার আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিবে। ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাও, দেখিবে, সেই স্বর্গের সুষমা আর নাই– নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকট যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোনো রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

সারাংশ : ক্রোধ এমন এক শক্তিশালী রিপু, যা মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে, মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ, কল্যাণকামিতা, স্বর্গীয় সুষমাকে বিলীন করে দিয়ে মানুষকে পশুতুল্য করে তোলে। ক্রোধের উত্তেজনায় একটি আনন্দদায়ী প্রসন্ন মুখ মুহূর্তেই কালিমালিপ্ত বিভীষিকায় পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নিচের সারাংশ / সারমর্মগুলো লিখুন।

ক.
আমি মরচ-কবি-গাহি-সেই বেদে-বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপØব–অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্র সুখে
সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে!
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব-সম কোন বাধা মানিল না,
বর্ষর বলি যাহাদের গালি পড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপ-মণ্ডুক অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি ভারে।

খ.
স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালবাসে,
সুখের আলো জ্বালে বুকে, দুঃখের ছায়া নাশে।
স্পর্শে তাহার নেচে উঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায়, পশুর হৃদয়তলে,
বুক ফুলায়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে।
দর্পকরে পদানত উচ্চ করে শির,
শক্তিহীনেও স্বাধীনতা আখ্যাদানে বীর।

গ.
আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে এক হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।
এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়–
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

ঘ.
আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,
সকলের সুখ, সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার
যদি না সবারে অংশ আমি দিতে পাই।
সকলের সাথে বন্ধু সকলের সাথে,
যাইব কাহারে বলো ফেলিয়া পশ্চাতে?
ভাইটি আমার সে তো ভাইটি আমার।
নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর,

সে আমার দুর্বলতা, শক্তি সে তো নয়।
সবই আপন হেথা, কে আমার পর?
হৃদয়ের যোগ সে কি কভু ছিন্ন হয়?
এক সাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি
এসো বন্ধু, এ জীবন মধুময় করি।

ঙ.
অতীতকে ভুলে যাও। অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামী কালের বোঝা অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎকেও অতীতের মত দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎকাল বলে কিছু নেই; মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। আজই ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও– আর শুধু কর দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

চ.
কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা কর, তারা বাঁচেনা। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে চেষ্টা করবে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভেতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুর আবশ্যকতা নেই।

ছ.
জীবন বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে, তা-ই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ রেখে। শুধু শুধু মাটির রস টেন গাছটা মোটাসোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কোন মালী গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজ-ব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। যখন এই চেতনা মানুষের চিত্তে জাগে তখন এক আধ্যাত্মিক সুষমায় তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত জগৎ আলোকময় হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষ ইতর জীবনের গুরুভার থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত হালকা মনে করে।

জ.
মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীব-সত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানব-সত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীব-সত্তার ঘর থেকে মানব-সত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষাই আমাদের মানব-সত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীব-সত্তার ঘরেও সে কাজ করে, ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায় শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও আছে, আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কি করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

পাঠ ৮.১৫ : ভাব-সম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ভাব-সম্প্রসারণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে হবেন।
- ভাব-সম্প্রসারণ রচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

ভাষার মাধুর্যময় আধারে ভাবের যথার্থ প্রকাশেই সাহিত্যিকের সিদ্ধি। কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় অনেক সময় ভাব-সংহত বাক্য বা চরণ থাকে, যার মিত-অবয়বে লুক্কায়িত থাকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত গূঢ় কথা, নিহিত থাকে ভূয়োদর্শনের শক্তি। ইঙ্গিতময়, রূপকাশ্রয়ী স্বল্প-বাক উক্তিগুলো বিশেøষণে বের হয়ে আসে জগৎ-জীবন সম্পর্কে বৃহৎ ভাব, জীবনের তত্ত্বদর্শন। এই ধরনের ভাবগূঢ় বাক্যগুলোর ব্যাখ্যা-বিশেøষণই হলো ভাব-সম্প্রসারণ। ভাবের সম্প্রসারণে বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়ে ওঠে। যথাযথ শব্দ প্রয়োগ আর উপমা, দৃষ্টান্ত, তুলনা ইত্যাদির আশ্রয়ে ভাবের সম্প্রসারণের কাজটি সম্পন্ন করতে হয়।

ভাব-সম্প্রসারণের তিনটি অংশ–

(১) আভিধানিক অর্থ
(২) মূল ভাব
(৩) মূল ভাব প্রকাশের উপযোগী যুৎসই দৃষ্টান্ত।

ভাব-সম্প্রসারণ রচনায় অনুসরণীয় –

১. বারংবার পাঠ করে উদ্ধৃত বাক্যের মর্মোদ্ধার করা প্রথম করণীয়।
২. বাক্যের অলংকারের আড়ালে নিহিত সারসত্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে।
৩. সহজ, সরল ও বাহুল্যবর্জিত বাক্য ব্যবহারে বিশেøষণ করতে হবে। প্রয়োজনানুসারে প্রাসঙ্গিকভাবে দৃষ্টান্ত, তথ্য ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে হবে।
৪. উপমাত্মক বাক্যের ভাব-সম্প্রসারণে উপমান ও উপমেয় অংশকে দুটো অনুচ্ছেদে বিশেøষণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রথম অনুচ্ছেদে থাকবে আক্ষরিক অর্থ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ব্যঞ্জনার্থ।
৫. ভাব-সম্প্রসারণ হবে মূলভাবের অনুসারী, অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য।
৬. প্রারম্ভিক বাক্যটি হবে সুসংহত, ঘনপিনদ্ধ ও শ্রুতিমধুর এবং ক্রিয়াপদ বিরহিত।
৭. নির্ভুল উক্তি ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে ভাব-সম্প্রসারণ হয়ে ওঠে সৌকর্যময়।
৮. উদ্ধৃতি ব্যবহারে লেখকের নাম ব্যবহার অবশ্যই পরিহার্য।
৯. সম্প্রসারিত ভাবের আয়তন ততটুকুই হবে, যতটুকুতে ভাবের প্রকাশ সম্পূর্ণতা পায়।
১০. বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি কঠোরভাবে পরিহার করতে হবে। এতে বক্তব্যের ভাব-গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতা বিনষ্ট হয়।

কতিপয় নমুনা

১.

পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।

ভাব-সম্প্রসারণ : পথ প্রকৃতির কোনো উপহার নয়; পথের সৃষ্টি মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের পদচারণায়। পথ তৈরির ক্ষেত্রে পথের কোনো ভূমিকা নেই। দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ জমিনের ওপর দিয়ে মানুষ চলাচল করতে করতে পথের সৃষ্টি করেছে। যত বেশি মানুষের যত বেশি চলার প্রয়োজন হয়েছে পথ তত বেশি প্রশস্ত ও দীর্ঘ হয়েছে। এটাই পথ সৃষ্টির ইতিহাস। পথের জায়গা আগেই ছিল, কিন্তু পথ ছিল না; মানুষ চলার গতিকে স্বচ্ছন্দ ও আরামদায়ক করার প্রয়োজনেই পথ সৃষ্টি

করেছে। মানুষ যেমন প্রয়োজনের তাগিদে পথ সৃষ্টি করেছে, তেমনি মানুষ জীবনযাপনকে সহজ, সুন্দর ও সাবলীল করার প্রয়োজনেই আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠেছে। প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিচিত্র উপাদান-উপকরণকে ব্যবহার করে সৃষ্টি করেছে বহু বিচিত্র জীবনোপকরণ। প্রকৃতিতে লোহা আগেই ছিল, কিন্তু কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে লোহা গলিয়ে বানিয়েছে বহু বিচিত্র ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি। এভাবেই কঠোর পরিশ্রম, কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রাণান্ত চেষ্টায় মানুষ গড়ে তুলেছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ সভ্য জীবন। মানুষ যখনই কোনো সংকটে পড়েছে, তখনই মনন ও শ্রম দিয়ে তা কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রকৃতির বৈরিতার কাছে মানুষ কখনো হার মানেনি; মানুষের অপরাজেয় মানসিকতা ও দুর্দমনীয় সংগ্রামের কাছে প্রকৃতি বশীভূত হয়েছে। পথ যেমন একদিনে তৈরি হয়নি, শত শত মানুষের নিরন্তর পদচারণায় তৈরি হয়েছে পথ, তেমনি মানবসভ্যতার উৎকর্ষ ও বিকাশের পেছনে রয়েছে অগণিত মানুষের শ্রম, অধ্যবসায়, নিরন্তর গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রয়াস। মানুষের কোনো অর্জনই সুলভ নয়; মানুষের সকল অর্জনের মূলে রয়েছে তার সর্বজয়ী মানসিকতা ও কঠোর শ্রম; হয়তো অনেক অর্জনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অপরিমিত রক্তঝরার ইতিহাস। কোনো বাধার সামনেই মানুষ থমকে দাঁড়ায়নি; চলার পথের প্রতিকূলতাকে জয় করার জন্য গভীর নিষ্ঠায় নতুন পথ সন্ধান করেছে। তাই বলা যায়, পথিকই অগ্রগামী, পথ পথিকের অনুগামী মাত্র।

২.

বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।

ভাব-সম্প্রসারণ : জীবনের প্রয়োজনে বিদ্যা; আর একারণেই বিদ্যাকে হতে হয় জীবনমুখী। মানুষ বিদ্যার্জনের মাধ্যমে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে। মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা মুক্তি পায় বিদ্যার স্পর্শে। মানুষের অনন্ত সৃজনশীল ক্ষমতার কেন্দ্রে নিহিত রয়েছে বিদ্যার যাদুস্পর্শ। বিদ্যা মানবজীবনের অন্ধকার দূর করে মানুষকে আলোকিত, সমৃদ্ধ ও মহীয়ান করে তোলে। বিদ্যার বলেই মানুষ ক্ষুদ্রতার গণ্ডিমুক্ত হয়, পৃথিবীর অফুরন্ত সম্পদকে করায়ত্ত করে, সমগ্র সৃষ্টিকুলের ওপর আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্যার আলোতেই প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় রহস্য ভেদ করে প্রকৃতিকে মানুষ আপন প্রয়োজনে ব্যবহারে সক্ষম হয়েছে। লোহা-লক্কড় দিয়েই ইঞ্জিন তৈরি হয়, যে কোনো ইঞ্জিনমাত্রই লোহা-লক্কড়ের সমষ্টি; কিন্তু লোহা-লক্কড়মাত্রই ইঞ্জিন নয়। মানুষ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে লোহা-লক্কড়কে ইঞ্জিনে রূপান্তরে সক্ষম হয়েছে। আবার প্রকৃতির সৌন্দর্য সবার সামনে সমানভাবেই দৃশ্যমান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রকৃতির রহস্য ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছেন, সাধারণ মানুষ সেভাবে উপলব্ধি করে না বা করতে পারে না। মানুষে মানুষে দেখার, শোনার, বলার এবং উপলব্ধির ক্ষমতার হেরফের হয় মানুষের জ্ঞানার্জনের তারতম্যের ওপর। জ্ঞান মানুষের সকল ইন্দ্রিয়ের চোখ খুলে দেয়, অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দেয়। মোদ্দাকথা হচ্ছে, অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিদ্যার্জন। বিদ্যার আলো-বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে ইতর প্রাণীর তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না; পশুর সঙ্গে মানুষের যতটুকু ব্যবধান রচিত হয়েছে সবটুকুর মূলে রয়েছে মানুষের জ্ঞানার্জনের প্রয়াস। বিদ্যার্জনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনকে উন্নত করা। অর্থাৎ বিদ্যাকে হতে হবে জীবনমুখী। যে বিদ্যা জীবনকে উন্নত করে না, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, জীবনের প্রয়োজন পূরণে অপারগ, সে বিদ্যা অর্থহীন। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা মানবসভ্যতার জন্য অনেক সময় বিপর্যয় ডেকে আনে। প্রসঙ্গত বলা যায়, প্রতিটি ধর্মের মৌলিক চেতনা হলো মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তি; মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্যই ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু ধর্মের খণ্ডিত ও জীবনবিমুখ শিক্ষা মানুষের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা ধর্মের নামে পরিচালিত সাম্প্রতিক সহিংসতা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবনধর্মী শিক্ষাই মানুষকে ধর্মে, কর্মে, জ্ঞানে মহিমান্বিত করে; আর জীবনবিমুখ শিক্ষা মানুষকে নিক্ষিপ্ত করে ধ্বংসস্তূপে।

৩.

বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়; গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

ভাব-সম্প্রসারণ : বিদ্যা অর্জনে চাই সাধনা; আর এ সাধনায় মূল ভূমিকা বিদ্যার্থীর, গুরুর ভূমিকা এখানে কেবল সাহায্যকারীর। বিদ্যা অর্জন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া; শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্মিলিত চেষ্টায় এ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে। বিদ্যা-অর্জনের প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা হলো দিক-নির্দেশনামূলক। তিনি একটি বিষয়কে বিশেøষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের

কাছে সহজবোধ্য করে তোলেন। কিন্তু বিষয়টি রপ্ত করে বিদ্যার্জনের প্রক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করার দায়িত্ব শিক্ষার্থীর। শিক্ষার্থীকে গভীর নিষ্ঠায় নিরন্তর চর্চার মাধ্যমে বিদ্যা অর্জন করতে হয়। শিক্ষার্থীর শৈথিল্য বিদ্যা অর্জনের প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করে দেয়। আর শিক্ষার্থীর কর্ম-প্রচেষ্টা ও সাধনা বিদ্যা অর্জনের কাজটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে। আকাশের মেঘ বৃষ্টি হয়ে মাটিতে নেমে এলে মাটি যেমন তা শুষে নিয়ে নিজেকে উর্বর করে এবং পত্র-পুষ্প-শস্যে নিজের বুক ভরিয়ে তোলে, তেমনি শিক্ষকের দেওয়া নির্দেশনা শিক্ষার্থী গভীর অধ্যবসায়ে আয়ত্ত করে নিজের ভেতরকার সুপ্ত চিন্তা ও জ্ঞানশক্তিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। আর এভাবেই শিক্ষার্থীর শিক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন ও সার্থক হয়ে ওঠে। শিশু যখন হাঁটতে চায়, তখন তার সামনে দুটো হাত বাড়িয়ে দিলে শিশুটির যেমন সাহস ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় এবং এক-পা দু-পা করে এক পর্যায়ে হাঁটা শিখে যায়। বড়দের কাজ শিশুর হয়ে হেঁটে দেওয়া নয়, বড়দের কাজ হলো অভয় দিয়ে সাহস জুগিয়ে শিশুকে হাঁটতে শেখানো। একইভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামনে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন, শিক্ষার্থী তার নিজের চেষ্টায়, সাধনায় বিদ্যার্জনের কাজটি সম্পন্ন করবে। গুরু বিদ্যার সন্ধান দেন, আর শিষ্য সেই বিদ্যার সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করে বিদ্যা আয়ত্ত করে নিজেকে আলোকিত করে এবং জগৎকে উপহার দেয় আলো। শিক্ষক শিক্ষার্থীর হাতে ধরিয়ে দেন জ্ঞানের দীপশিখা, আর শিক্ষার্থী সেই দীপশিখা হাতে জগতের অনন্ত রহস্যের আঁধার ভেদ করতে করতে অকুতোভয়ে এগিয়ে চলে। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থী নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান পায়, আর সেই জ্ঞানের আলোয় পৃথিবীকে আলোকিত করে, সাধন করে মানুষের অশেষ কল্যাণ। উদাহরণস্বরূপ গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, পেøটো, এরিস্টটলের কথা বলা যায়। সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন পেøটো আর পেøটোর ছাত্র ছিলেন এরিস্টটল। গুরুর কাছ থেকে বিদ্যার নির্দেশনা পেয়ে তাঁরা জ্ঞানের সাধনায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন এবং জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। জ্ঞান-সাধনায় গুরু-শিষ্যের এই অনন্য দৃষ্টান্ত মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাঁদেরকে অম্লান করেছে। বলা যায়, শিক্ষক জ্ঞানের সাধনায় পথ-প্রদর্শক; কিন্তু জ্ঞানের পথটি মাড়িয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব শিক্ষার্থীর এবং এ সাধনা নিঃসন্দেহে কঠিন ও শ্রমসাপেক্ষ।

৪.

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

ভাব-সম্প্রসারণ : পরার্থপরতায় পরম আনন্দ, অনাবিল সুখ এবং গভীর পরিতৃপ্তি। পরের হিতার্থে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। পরহিতব্রতী মানুষেরাই পায় জগতে অমরত্বের স্বীকৃতি। একক মানুষ খুবই ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য। ক্ষুদ্রতার বৃত্ত ভেঙে সমষ্টির অংশ হওয়ার প্রয়োজনেই মানুষ গড়ে তুলেছে সমাজ। সমাজের মধ্যে সে খুঁজে পায় বৃহত্তের পরিধি। এজন্য মানুষকে আত্মপরায়ণতার ক্ষুদ্র পরিচয় বিসর্জন দিতে হয়; সমাজের বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখের জীবনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে হয়। নিজের হিতাহিত ভুলে গিয়ে জগতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করলেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানবজনম সার্থক হয়। জগতের সকল মানুষের কল্যাণচিন্তা ও মঙ্গলকামনার মধ্যেই মানুষের মনে এক নিবিড় শান্তি লুকিয়ে থাকে। জগতের ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত হওয়া মানেই উদার, উন্মুক্ত আকাশের তলা থেকে সরিয়ে নিয়ে আলো-বাতাসহীন ক্ষুদ্র গৃহকোণে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলা। আত্মতাময় জীবনে বৃহৎজীবনের সঙ্গে কোনো যোগ থাকে না, আনন্দ-বেদনার কোনো প্রবাহ থাকে না; তাই সেই বিচ্ছিন্ন জীবনে কোনো শান্তি-স্বস্তিও থাকে না। স্বার্থমগ্ন মানুষেরা অন্যের ভালবাসার উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হয়ে এক হাহাকারক্লিষ্ট হতভাগ্য জীবন যাপন করে। জীবদ্দশায় সে বৃহৎজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, মৃত্যুর পরে সে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ইতর প্রাণীদের মতো। বনের পশুরা রিপুর তাড়না নিয়ে আত্মতাময় জীবন কাটায়, আবার প্রকৃতির নিয়মে একসময় মৃত্যুকেও বরণ করে নেয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ইতর প্রাণীর চূড়ান্ত অবসান ঘটে, জগতে তার অস্তিত্বের কোনো চিহ্নরেখা অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু একজন সার্থক মানুষের মহাজীবন শুরুই হয় তার মৃত্যুর পরে; সে জীবন অমরত্বের। মানুষের প্রতি তার আত্মনিবেদন ও কর্মের পরিধির নিরিখেই মহাকালের পৃষ্ঠায় তার স্থান নির্দিষ্ট হয়। মানুষ মানুষের চেতনায় বেঁচে থাকে তার মহৎ কর্মের মধ্য দিয়ে, মানবমঙ্গলে তার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে। আত্মসুখে বিভোর মানুষেরা সেই মহাজীবনের খোঁজ পায় না, সেই জীবনের তৃপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়। অবসাদ ও হতাশায় মোড়ানো জীবন কাটিয়ে ইতর প্রাণীর মতোই একসময় সে চিরতরে হারিয়ে যায়। এই পরিচয় মানুষের জন্য কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। যাবতীয়

ইতর-প্রবৃত্তি, স্বার্থান্ধতা ও আত্মসুখের ভাবনা পরিত্যাগ করে মানুষ হবে সকলের প্রতি দায়িত্বশীল, পরহিতব্রতী, জগতের মঙ্গলসাধনে আত্মনিবেদিত – সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে এটিই মানুষের আসল পরিচয়।

৫.

দুঃখের মত এত বড় পরশ পাথর আর নেই।

অথবা,

সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা,
আশা তার একমাত্র ভেলা।

ভাব-সম্প্রসারণ : সুখের কামনা মানুষের চিরায়ত, দুঃখের আঁচ জীবনে পড়ুক তা কেউ কখনো কামনা করে না। কিন্তু দুঃখ জীবনে আসে জীবনের নিয়মেই; আসে পালা করে। দিন-রাতের আবর্তনের নিয়মেই যেন সুখ-দুঃখ জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তাই সুখের দিনের আনন্দের পাশাপাশি জীবনের দুঃখ-রাতির ঘন-তমসার জন্যও মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হয়। আবার সীমাহীন দুঃখের মধ্যেও মানুষ আশান্বিত হতে পারে এই ভেবে যে, দুঃখ কোনো চিরন্তন ব্যাপার নয়; রাতের অবসানে যেমন অরুণোদয় হবেই। জীবন কখনোই পুষ্পশয্যা নয়, সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কারোর জন্যই নির্ধারিত নয়। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের প্রত্যাশা বিপুল। বলাবাহুল্য, প্রত্যাশা কখনো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে যায় না; প্রত্যাশা পূরণের জন্য মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়, কখনো লিপ্ত হতে হয় কঠোর সাধনায়। কখনো বহু কষ্টে পূরণ হয় প্রত্যাশা; আবার অনেকসময় কোনো চেষ্টায়ই ঘটে না প্রত্যাশা-প্রাপ্তির মেলবন্ধন। জীবনে নেমে আসে গভীর হতাশা, দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে জীবন। কিন্তু চিরঞ্জয়ী মানুষেরা কখনোই পরাভূত হয় না, হতাশাকে নিত্য সত্য বলে ভাবে না, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে রচনা করে নতুন স্বপ্নের জাল। অসীম ধৈর্য ও সাহসে যে ব্যক্তি লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকে, দুঃখের দীর্ঘ আঁধার কেটে তার জীবনে সুখের সোনালি সকাল আসবেই। প্রত্যাশা যত বড় হবে, তা অর্জনের পথে বাধাবিঘ্ন, ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-যন্ত্রণার মাত্রাও হবে তত গভীর ও ব্যাপক। কোনো কিছু অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্টের মূল্য যত বেশি হবে, তার প্রাপ্তির আনন্দও হবে তত বেশি প্রশান্তিদায়ক। জগৎ-সংসারে অভাব আমাদের নিত্য তাড়া করে, অভাব পূরণ হলে আমাদের মন আনন্দে দ্রবীভূত হয়, আবার অপূরণের অনেক কষ্ট মনের কোণে ভিড় জমায়। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া মানুষের পক্ষে সাজে না, বরং পরম ধৈর্যে ও নিষ্ঠায় দুঃখকে জয় করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটাই মানুষের জন্য স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে, দুঃখই মানুষের জীবনের সাফল্যের বীজমন্ত্র। মানুষের সকল বড় অর্জনের পটভূমিতে আছে সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের ইতিহাস। মাতৃত্বের আনন্দ কষ্ট ছাড়া অসম্ভব; বিজয়ের মূল্যও দুঃখের মধ্যেই নিহিত। জীবনে কষ্ট যত তীব্র ও ঘনীভূত হয়, সুখের সম্ভাবনা তত নিকটবর্তী হয়। জীবনে কষ্ট এক পরশ পাথর, কষ্টের ভেতর থেকে উদ্ভব ঘটে মানুষের বড় কোন সাফল্যের। পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন এমন সকল কীর্তিমান মানুষের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের প্রত্যেককেই ভীষণ কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। চরম বৈরী পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁদেরকে সংগ্রাম করতে হয়েছে – কখনো কখনো মৃত্যু এসে হানা দিয়েছে তাঁদের জীবনে। কিন্তু চরম বিপর্যয়েও মহামানবদের আশাহত হতে দেখা যায় না। সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় আগামী নির্মাণের স্বপ্নে তাঁরা অবর্ণনীয় কষ্টকেও অম্লান বদনে সহ্য করেছেন। তাই কষ্টকে অস্বীকার করে নয়, কষ্টে মূহ্যমান হয়েও নয়, কষ্টের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েই বুকভরা আশা নিয়ে মানুষকে সাফল্যের সরণিতে উপনীত হওয়ার সাধনা করতে হবে।

৬.

দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য। সর্পের মস্তকে মণি থাকিলেও তাহা কি ভয়ংকর নহে?

ভাবসম্প্রসারণঃ বিদ্বান ব্যক্তি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও অনুসরণীয়; কারণ একজন বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রভাবে সচ্চরিত্রবান হয়ে ওঠেন। বিদ্যার প্রভায় তিনি নিজে আলোকিত হন, সমাজকে আলোকিত করেন; জ্ঞানে শুচি-স্নাত হয়ে নিজে শুদ্ধ হন, সমাজকে দেখান শুদ্ধতার পথ। তবে বিদ্যা অর্জন করেও যদি কোনো মানুষ চেতনাগতভাবে অসচ্চরিত্রের হন, তাহলে তাকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করাই সমুচিত।

বিদ্যা মানুষের পরম ধন। বিদ্যা মানুষের মধ্যে বিবিধ মানবীয় গুণাবলির সমাবেশ ঘটায়, মানুষকে শুভবোধে উদ্দীপ্ত করে, মানুষকে কল্যাণব্রতে অনুপ্রাণিত করে। অর্থাৎ, এককথায় বিদ্যা মানুষকে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে। একজন বিদ্বান

ব্যক্তি সত্য ও কল্যাণের প্রতি হবেন গভীর অনুরাগী। লোভ-হিংসার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন শুদ্ধচিত্তের মানুষ হিসেবে। ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠায় তিনি হবেন সমাজের পথিকৃৎ। একজন বিদ্বান ব্যক্তির কথাবার্তায় ও আচার-আচরণে বিচ্ছুরিত হবে পবিত্রতার দ্যুতি। তিনি তাঁর লব্ধ জ্ঞানকে সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির কাজে প্রয়োগ করেন; তাঁর দ্বারা সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। মহানবী (স)-এর প্রতি পবিত্র কোরানের প্রথম বাণীই ছিল 'ইকরা' অর্থাৎ পড়ো। ইসলামে বিদ্যার্জনকে নর-নারীর জন্য ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে এবং মহানবী (স) বিদ্বানের মর্যাদা নির্দেশ করতে গিয়ে বিদ্বানের কলমের কালিকে শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্র বলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাস্তব যে, সমাজে এমন কিছু বিদ্বান লোক দেখা যায়, যারা শিক্ষিত হলেও বিদ্যা তাদের চরিত্র গঠনে কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি। বিদ্যার বদৌলতে কিছু কিছু বিষয়ে তাদের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধি পেলেও তাদের চেতনাগত দিকের কোনো উৎকর্ষ সাধন হয়নি। শিক্ষাহীন, অন্ধচেতন মানুষের মতো লোভ, হিংসা, স্বার্থান্ধতা – এসব পশুপ্রবৃত্তি তাদের মজ্জার গভীরে রয়েই গেল। উপরন্তু শিক্ষার সংশেøষে তাদের প্রবৃত্তি দুর্দমনীয় ও অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। মানুষের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ বিন্দুমাত্র নেই, মানুষকে পদদলিত করার এক হিংস্র ক্রোধ তাদের সার্বিক আচরণে ফুটে ওঠে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনে দুর্জন বিদ্বানেরা তাদের বিদ্যার অপব্যবহার করে থাকে, যা সমাজের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। শিক্ষাবঞ্চিত মানুষেরা সমাজের জন্য কোনো বৃহত্তর কল্যাণ করতে অক্ষম; কিন্তু দুর্জন বিদ্বান সমাজের জন্য এক ভয়ঙ্কর দুষ্টক্ষত। সমাজের অনিষ্ট করার ক্ষমতা তাদের অশিক্ষিত মানুষদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। চরিত্রহীন বিদ্বান তার বিদ্যাকে অন্যায় কাজে ব্যবহার করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি শ্রদ্ধাভাজন হলেও চরিত্রহীন, দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বান কোনোভাবেই সম্মান লাভের যোগ্য নয়। লোকমুখে প্রচলিত আছে কোন কোন বিষধর সাপের মাথায় অতিমূল্যবান মণি থাকার কথা। জীবনঘাতী বিষের জন্যই সাপের মাথার মণি মহামূল্যবান হলেও কার্যত মূল্যহীন। অনুরূপভাবে বিদ্যা যত মূল্যবানই হোক দুর্জনের বিদ্যা কোনো মূল্য বহন করে না; তার সাহচর্য কোনো অবস্থাতেই শুভ নয়। এধরনের লোকের সাহচর্যে নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হতে পারে। বিদ্যার চেয়ে চরিত্র অধিকতর মূল্যবান; চারিত্রিক শুদ্ধতা রক্ষার জন্যই দুর্জন বিদ্বানের সাহচর্য সর্বদাই পরিত্যাজ্য।

৭.

দণ্ডিতের সাথে –
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

ভাব-সম্প্রসারণ : সামাজিক শৃঙ্খলার প্রয়োজনে অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রে বিচারিক ব্যবস্থা চালু থাকে। অন্যায়কারীর যথাযথ শাস্তিবিধানের মাধ্যমে বিচারক সমাজের শান্তিরক্ষার মহান ব্রত পালন করে থাকেন। বিচারকের দণ্ডদান অমানবিক বা অনৈতিক কোনো কাজ নয়; বরং তাঁদের কর্মকাণ্ডে সুরক্ষিত হয় সমাজ, সমাজে অপরাধপ্রবণতা থাকে নিয়ন্ত্রণে। বিচারকের দায়িত্ব হলো পক্ষপাতহীনভাবে অন্যায়কারীর শাস্তি নিশ্চিত করা। বিচারকের নিরপেক্ষতা মানে নির্মোহতা নয়; তিনি যান্ত্রিক কৌশলে বিচার কাজ পরিচালনা করবেন না। বিচারক হবেন মানবিক, দণ্ডদানের ক্ষেত্রে দণ্ডিতের প্রতি তিনি হবেন সংবেদনশীল; যাতে অযাচিত কোনো কঠোরতা দণ্ডের মধ্যে না থাকে। কঠোর দণ্ডের মাধ্যমে অপরাধীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মধ্যে বিচারের উদ্দেশ্য নিহিত নয়; সেই বিচারই উত্তম যা অপরাধীর মনে অনুশোচনার জাগরণ ঘটায়, অপরাধীর সংশোধিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

মানুষের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, লোভ-লালসা, মোহ – এসব সহজাতভাবেই ক্রিয়াশীল। এসব রিপুর তাড়নায় মানুষ কখনো ইচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায় সমাজবিরুদ্ধ কাজে জড়িয়ে যায়। সমাজ থেকে অপরাধ দূরীকরণে অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতেই হয়। কিন্তু দণ্ডদানে বিচারকের মন যদি দণ্ডিতের প্রতি সমবেদনায় দ্রবীভূত হয়, বিচার হয় দণ্ডিতের বেদনাস্পর্শী, তাহলে অপরাধীর সুপ্ত মানবিক চেতনায় হয়তো তা দাগ কাটতে পারে। তাতে অপরাধীর হারানো মনুষ্যত্ববোধের পুনর্জাগ্রত হওয়ার একটি অবকাশ থেকে যায়। অনুশোচনার দহনে যদি অপরাধী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে, তাহলে সে বিচারই হবে সর্বাংশে ফলপ্রসূ। বিচারক অপরাধকে ঘৃণা করবেন, অপরাধীকে নয়। কিন্তু বিচারক যদি অপরাধীর প্রতি ঘৃণাবশত বৈরী হন, তাহলে সহমর্মিতা রহিত বিচারে অপরাধীর স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের সুযোগটি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। তাই বিচারের উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনেই বিচারককে হতে হয় দণ্ডিতের প্রতি সমবেদনায় কাতর।

৮.

নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?

ভাবসম্প্রসারণ : মা আর মাতৃভাষা মানুষের চেতনায় একই সূত্রে গাঁথা। জন্মের পরে মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে যোগসূত্র তৈরি হয় তা মাতৃভাষার কল্যাণে। একারণেই মাতৃভাষা মানুষের রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জার সঙ্গে বিমিশ্র হয়ে থাকে। মাতৃভাষায় মিশে থাকে অমৃত; তাই মাতৃভাষায় মানুষের আবেগ শত সুরে ঝংকার তোলে। পৃথিবীতে হাজারো ভাষার মেলা; কিন্তু মাতৃভাষার মতো এত মধুময়, এত মায়াময়, এত স্বতঃস্ফূর্ত আর কোনো ভাষাই নয়। প্রাণ যেন কলকলিয়ে ওঠে মাতৃভাষায়। ভাব আর আবেগ প্রকাশে এমন পরিপূর্ণ আনন্দ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায়ই সম্ভব নয়। বিদেশি ভাষা মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে কষ্টেসৃষ্টে আয়ত্ত করে, বিদেশি ভাষায় দস্তুর মতো কাজও চলে; কিন্তু সুপ্রচুর প্রাণের বন্যা বওয়ানো একমাত্র মাতৃভাষায়ই সম্ভব। মানুষের ভাব প্রকাশের সর্বোত্তম বাহন মাতৃভাষা; আপন মনোভাব প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীই তার মাতৃভাষায় সাবলীল; কারণ মাতৃভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি গড়ে ওঠে সংশিøষ্ট জাতিগোষ্ঠীর আত্মিক রসকে জারিত করে। বাঙালি হিসেবে বাংলা আমাদের সত্তার ভাষা। বাংলাই আমাদের প্রথম ভালবাসা, আমাদের ভাবাবেগ প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। বাংলাভাষার মাধ্যমেই আমাদের প্রাণ পায় সজীবতা, চেতনা হয়ে ওঠে দীপ্তিময়। আমাদের চিন্তার শুরু, বিকাশ ও পরিণতি সবই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে। মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা করলে তা চেতনার গভীরে স্থান পায়; জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা পায় পরিপূর্ণতা। সার্বিকভাবে মাতৃভাষার সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে একটি জাতিরই সমৃদ্ধি সাধিত হয়। মাতৃভাষা-প্রীতি মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমকে গভীর করে, আপন জাতিসত্তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে। চীন, জাপান, জর্মন প্রভৃতি উন্নত দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাতৃভাষাকে তারা তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য চর্চার বাহন করে দেশের মানুষের চেতনাজগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। আর জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলায় সমৃদ্ধ মানুষেরাই নির্মাণ করেছে সমৃদ্ধ দেশ। বাঙালি হিসেবে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আমাদের গভীর ভালবাসা ও মমত্ববোধ থাকা উচিত। মাতৃভাষার অবারিত চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা গৌরবময় অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারব। মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা আমাদেরকে পরাশ্রয়ী জাতিতে পরিণত করবে, যা আমাদের কারোরই কাম্য হতে পারে না। আমাদের জন্য এক অনন্ত অনুপ্রেরণা হলো, অতীতে বাংলা ভাষার অবমাননা আমরা মেনে নেইনি, শরীরের রক্ত ঢেলে আমরা এর মর্যাদা রক্ষা করেছি।

৯.

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

ভাব-সম্প্রসারণ : মানব জীবনের সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত বস্তু স্বাধীনতা – সেটা হোক ব্যক্তিগত, হোক রাষ্ট্রীয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কল্পনাও করা যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করা খুবই কষ্টসাধ্য; এর জন্য বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, ঝরাতে হয় বহু তাজা প্রাণের রক্ত। শক্তিপ্রমত্ত আগ্রাসী শক্তি কখনো পদানত জাতিকে স্বাধীনতা দিতে চায় না, বহু আত্মত্যাগের রক্তাক্ষরে লিখে নিতে হয় স্বাধীনতার সনদ।

পরাধীনতা কোনো জাতির জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ। রুদ্ধ কারাগারে অবরুদ্ধ মানুষের মাথা ঠুকে মরার এক করুণ যন্ত্রণা এই পরাধীনতার মধ্যে নিহিত। পরাধীনতা নিজগৃহে অন্যের দাসত্ব করার আত্মিক রক্তক্ষরণে একটি জাতিসত্তার মৃত্যু ঘটায়। নিজের মতো করে প্রাণের প্রাচুর্যে বাঁচার জন্য স্বাধীনতা এক পরম ধন। বহু মানুষের আত্মত্যাগের সীমাহীন মূল্যে দুর্বৃত্তের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা যায়; কিন্তু স্বাধীনতাটিকে রক্ষা করার জন্য আরো কঠিন সাধনার প্রয়োজন হয়। কারণ স্বাধীন দেশের ভেতরে বাইরে সক্রিয় থাকে অসংখ্য প্রকাশ্য ও গুপ্ত শত্রু; আগ্রাসী শত্রু ফিরে পেতে চায় হারানো উপনিবেশের ওপর পুরনো কর্তৃত্ব। তারা দেশের স্বাধীনতা হরণে প্রতিনিয়ত বিচিত্র ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে তৎপর থাকে। তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন জনগণের সম্মিলিত সচেতনতা ও স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদাবোধ। একটি দেশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে হলে ঐ দেশের জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানো অনিবার্য। দেশকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেশের আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। দেশের

অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড যদি মজবুত হয় এবং জনগণকে নিরক্ষরতামুক্ত করা সম্ভব হয়, তবেই জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা দৃঢ়বদ্ধ হবে এবং দেশের অর্জিত স্বাধীনতা আর কখনো বিপন্ন হবে না। সকল নাগরিকের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে দেশাত্মবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে জনগণকে স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত করা সম্ভব হলেই দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে।

১০.

স্বদেশের উপকারে নাই যার মন,
কে বলে মানুষ তারে; পশু সেইজন।

ভাবসম্প্রসারণ : মানুষের মহৎ গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হলো স্বদেশপ্রেম। জন্মভূমিকে ভালবেসে তার কল্যাণ-চেষ্টায় নিজেকে নিবেদন করার মধ্যেই একজন মানুষের দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দেশপ্রেম যার মধ্যে নেই মানুষ হিসেবে সে ঘৃণিত ও নিন্দিত।

জন্মভূমি মায়ের মতোই একান্ত আপনার ধন। প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বের বুনিয়াদ নির্মিত হয় জন্মভূমির কোলে। মায়ের দুগ্ধ পান করে যেমন শিশু পুষ্ট হয়, মায়ের পরম স্নেহ গায়ে মেখে শিশু বেড়ে ওঠে, তেমনি জন্মভূমির রস অনুপান করে, ধুলোবালি, আলো-বাতাস গায়ে মেখে একজন মানুষ পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়। তার অস্তিত্বের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকে জন্মভূমির বিচিত্র উপাদান। জন্মভূমির সঙ্গে তৈরি হয় আত্মার বন্ধন। তাই জন্মভূমির প্রতি মানুষের থাকে এক সহজাত অনুরাগ। স্বদেশকে ভালবাসা মানুষের এক পবিত্র কর্ম হিসেবে পরিগণিত। স্বদেশ যেমন পরম মমতায় কোল জুড়ে তার সন্তানদের আশ্রয় দেয়, সন্তানদেরও স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা পোষণ করা এক বিশেষ কর্তব্য। মা যত দরিদ্রই হোক একজন সন্তানের জন্য মায়ের যেমন কোনো বিকল্প নেই, ঠিক তেমনি নিজের দেশ যত ক্ষুদ্র, দরিদ্রই হোক না কেন, জন্মভূমির চেয়ে সেরা কোন দেশই নয়। একজন দেশপ্রেমিক মানুষের মধ্যে থাকে দেশের জন্য সর্বস্ব উজাড় করা ভালবাসা, দেশের সম্পদে-বিপদে সবসময় স্বদেশ-লগ্ন থাকার এক অকৃত্রিম অনুভূতি। একজন দেশপ্রেমিক লোকের কাছে স্বদেশ হলো– 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।' দেশপ্রেমিক ব্যক্তি স্বদেশের কল্যাণ ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে পারে না। দেশ ও জাতির উপকার করতে পারলেই নিজের জীবনকে সার্থক মনে করে। মাতৃভূমি মানুষের কাছে এত প্রিয় যে, দেশের বিপদে মানুষ নিজের জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও দেশে এমন কিছু মানুষ থাকে, যারা দেশের সঙ্গে কোনো বন্ধন অনুভব করে না, দেশের প্রতি থাকে না তাদের কোনো দায়িত্ববোধ, দেশের কল্যাণে তাদের কোনো অবদান থাকে না, বরং দেশকে ব্যবহার করে নিজের নোংরা স্বার্থে, এমনকি নিজের স্বার্থের জন্য নিজের দেশকে বিকিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এরা মানুষ হিসেবে অধম, পশুতুল্য। দেশপ্রেমহীন এই নরাধমেরা যতই গুণবান, জ্ঞানী ও সম্পদশালী হোক না কেন তারা বর্জ্যরূপে পরিত্যাজ্য। দেশপ্রেমেই মানুষের মহত্ত্বের পরিচয়, দেশের প্রতিটি মানুষেরই উচিত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

নিজে করুন : (সংকেতসহ ভাব-সম্প্রসারণ)

১. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

সংকেত: পদ্মফুলের অনিন্দ্য সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য যেমন কাঁটার আঘাত সহ্য করতে হয়, তেমনি জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য সাফল্যকামী মানুষকে পাড়ি দিতে হয় দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত দীর্ঘ বন্ধুর পথ।

২. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

সংকেত: অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী দুজনেই সমান অপরাধী; আর দুজনেই সমান ঘৃণিত। অন্যায়কারী তার কৃতকর্মের জন্য স্বাভাবিকভাবে ঘৃণাযোগ্য। অন্যায়কারীর অন্যায়ের প্রতিবিধান না করলে অন্যায়কেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং

সমাজে অন্যায়ের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে যে ব্যক্তি অন্যায়কে সহ্য করে নেয় অন্যায়কারীকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে সেই ব্যক্তি অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা হিসেবে অন্যায়কারীর মতোই অপরাধী।

৩. বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

সংকেত: আপন পরিবেশেই কোন কিছুর প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেই বস্তুটি তার সৌন্দর্য হারায়। বনের পশুকে শখ করে খাঁচায় বন্দী করলে অথবা শিশুকে তার মায়ের কোল থেকে ছিন্ন করলে তার প্রাণ-প্রাচুর্য হারায়, তার সৌন্দর্যের হানি ঘটে। কোন কিছুর প্রকৃত সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে হলে তাকে তার পরিবেশে রেখেই তার দিকে তাকাতে হবে।

৪. স্পষ্টভাষী শত্রু নির্বাক মিত্র অপেক্ষা শ্রেয়।

সংকেত : শত্রু বিপজ্জনক; কিন্তু নির্বাক মিত্র আরো বেশি বিপজ্জনক। শত্রু শত্রুতাবশত অন্যের কাছে কোনো ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি, খুঁত প্রচার করে বেড়ায়। এতে শত্রুর কারণে মানুষকে সমাজে হেয় হতে হয়। এর একটি উপকারী দিকও আছে, নিজের দোষ-ত্রুটির সন্ধান জেনে নিজেকে সংশোধন করার অবকাশ থাকে। আর যে মিত্র ভালবাসার টানে বা সম্পর্ক-রক্ষার তাগিদে কারোর দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে উদাসীন থাকে, তার মাধ্যমে ব্যক্তিটির প্রকৃত উপকার হয় না, বরং তার কারণে ভবিষ্যতে বড় কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃত বন্ধু সে-ই যে কোনো ব্যক্তিকে তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সংশোধনের পথ বাতলে দেয়।

৫. তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপাখি সহজেই পশুপাখি, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

সংকেত : প্রকৃতির সবকিছুই স্বাভাবিক নিয়মে জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে, আবার মৃত্যুতে সমর্পিত হয়। প্রকৃতির সন্তান হলেও মানুষের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। মানুষের আদল নিয়ে জন্ম নিলেই মানুষ মানুষ হয়ে যায় না। মানুষকে মানুষ হওয়ার জন্য মনুষ্যত্ববোধ অর্জন করতে হয় এবং এটি অবশ্যই সাধনা সাপেক্ষ।

৬. দ্বার বন্ধ করে ভ্রমটাকে রুখি
সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?

সংকেত : সত্য ও মিথ্যার মিশেলে এ জগৎ গড়ে উঠেছে। সত্য আমাদের কাঙ্ক্ষিত; কিন্তু মিথ্যাকে বিসর্জনে পাঠিয়ে সত্যকে পাওয়া সম্ভব নয়। মিথ্যা বা ভুলের ভেতর দিয়েই মানুষ সত্যের সন্ধান পায়। মিথ্যাকে রুখতে গিয়ে আসলে সত্যই হারিয়ে যায়। ভুলের ভয়ে কাজ বন্ধ রাখলে কখনো কোনো কাজই করা সম্ভব হয় না, সেটি সঠিক বা ভুল যা-ই হোক।

৭. গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলেও প্রয়োজন।

সংকেত : বিদ্যা আর ধনের সার্থকতা প্রয়োগ সামর্থ্যে। বিদ্যা ও ধনের মূল্য অনেক; কিন্তু প্রয়োজনের সময় কাজে না লাগলে বিদ্যা ও ধন মূল্যহীন। বইয়ে জ্ঞান অক্ষরবদ্ধ থাকে, বই কিনলেই জ্ঞান অর্জন হয়ে যায় না, বইয়ের জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মগজে প্রবেশ না-করা পর্যন্ত তা মানুষের কোনো কাজে লাগে না। আবার অন্যের হাতে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ যতই হোক না কেন তা প্রয়োজনের সময় ইচ্ছামতো ব্যয় করা সম্ভব হয় না। কার্যত সে অর্থ থাকা না-থাকা সমান কথা। অর্থ-বিদ্যা থাকার চেয়ে তার ব্যবহারিক মূল্যটাই গুরুত্বপূর্ণ।

৮. জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বরে।

সংকেত : স্রষ্টা নিরাকার, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি দৃশ্যমান। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার প্রকাশ এবং সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা বিরাজমান। স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য মানুষের ব্যাকুল আরাধনা এবং স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ না-পাওয়ার বেদনাও মানুষের সীমাহীন। কিন্তু মানুষ ভুলে যায়, গভীর ভালবাসা থেকেই স্রষ্টা সৃষ্টির মেলা সাজিয়েছেন। তাই সৃষ্টির সেবার মধ্যেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি; সৃষ্টিকে ভালবাসলেই স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ হয়ে যায়। জীবের প্রতি প্রেমের মধ্য দিয়েই স্রষ্টাকে পাওয়া সম্ভব।

৯. রাতে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা,

সূর্য নাহি ফিরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

সংকেত : যা কিছু পাওয়া হয়নি তার বেদনায় মূহ্যমান না হয়ে, যা কিছু হাতের কাছে আছে তার মধ্যেই প্রাপ্তির আনন্দ সন্ধান করা সমীচীন। নিত্য পরিবর্তনের স্রোতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসকে উপভোগ্য করা সম্ভব হলেই জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

১০. **শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,**
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

সংকেত : প্রকৃত মহৎ ব্যক্তিরা হিসাবের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নিজেদের আটকায় না, তাদের সাধনাই হয় নিজেকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতে। আর যারা ক্ষুদ্র-তুচ্ছ, তারা সব সময়ই নিজের সামান্য দানকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের ভাব-সম্প্রসারণগুলো নিজে করুন:

১. মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।
২. পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।
৩. সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।
৪. তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?
৫. প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই।
৬. সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া।
৭. ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনির কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।
৮. নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশের পরিচয়
সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়।
৯. পরের অনিষ্ট চিন্তা করে যেই জন,
নিজের অনিষ্ট বীজ করে সে বপন।
১০. সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।

পাঠ ১৬ : সংলাপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সংলাপ কী তা বলতে পারবেন।
- সংলাপের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

সংলাপ হলো দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন বা আলাপ। সংলাপে সাধারণত কোনো বিষয়ের উপর দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মত বিনিময় করে থাকে। প্রতিদিন আমরা একে অপরের সঙ্গে অনেক কথা বলে থাকি। এই কথার সবগুলো গোছানো বা সুসংহত নয়। কোনোটি বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ, কোনোটি আবার উপযুক্ত শব্দ দিয়ে গঠিত নয়। ইংরেজি Dialogue –এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে সংলাপ। আমরা একে অন্যের সঙ্গে যে কথা বলি অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনকে সংলাপ বলা হয়।

সংলাপের বৈশিষ্ট্য

১। সংলাপে একটি বিষয় থাকবে। কোন সংলাপ রচনা করতে গেলে একটি বিষয় ঠিক করে নিয়ে মনের মধ্যে তা গুছিয়ে নিতে হবে ভালোভাবে।
২। সংলাপ সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩। সংলাপের ভাষা সহজ সরল প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত।
৪। সংলাপ যেন গুরুগম্ভীর ও বক্তৃতাধর্মী না হয়।
৫। ইতিবাচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংলাপ শেষ হওয়া ভালো।

কিছু সংলাপের নমুনা

ভবিষ্যতে কী হতে চাও তা নিয়ে পিতা-পুত্রের সংলাপ

ভবিষ্যতে কী হতে চাও তা নিয়ে পিতা-পুত্রের সংলাপ নিচে দেয়া হলো :

বাবা : অতনু, কেমন আছ ? তোমার এইচএসসির ভালো ফলাফলে আমি খুবই খুশি। এখন ভবিষ্যতে তুমি কী হতে চাও ?

ছেলে : আপনিই তো সব নির্দেশ দেন আমাকে। আপনি যা চাইবেন সেটাই করার চেষ্টা করবো।

বাবা : আমি প্রথমে তোমার পছন্দকে গুরুত্ব দিতে চাই।

ছেলে : আপনি যদি আপত্তি না করেন তবে আমি ডাক্তার হতে চাই।

বাবা : কেন তুমি ডাক্তারি পেশাকে পছন্দ করলে ?

ছেলে : ডাক্তারি একটি মহান পেশা। সমাজের সবশ্রেণির মানুষকে সেবা দেয়া যায়।

ঊাবা : তোমার পছন্দকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু মনে রাখবে এ পেশায় পরিশ্রম, ধৈর্য ও মানবিক গুণের ভীষণ দরকার।

ছেলে : হ্যাঁ বাবা, আমি তা জানি। আমাদের মতো গরিব দেশে অনেক লোক চিকিৎসা পায় না, অবহেলায় অনাদরে মারা যায়। বিশেষ করে গ্রাাঞ্চলে। আমার খুব ইচ্ছা ডাক্তার হয়ে পলিø অঞ্চলে গরিব মানুষদের চিকিৎসা দেব।

বাবা : গ্রামের দরিদ্র মানুষদের সেবা করতে চাও জেনে খুব খুশি হলাম। তোমার প্রতি অনেক আশির্বাদ রইল।

ছেলে : আশির্বাদ করো বাবা, আমি যেন আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারি।

একজন ফুল ক্রেতা ও ফুল বালিকার মধ্যে সংলাপ

ফুল ক্রেতা ও ফুল বালিকার মধ্যে সংলাপ নিচে দেয়া হলো :

বালিকা : স্যার, ফুল লইবেন, ফুল ? লন না স্যার একটা ?
ক্রেতা : কী ফুল দেখি ?
বালিকা : স্যার, গোলাপ আর বকুল আছে। কুনটা লইবেন স্যার ?
ক্রেতা : কত দাম ? টাটকা তো ?
বালিকা : হ স্যার, এক্কেবারে টাটকা। গোলাপ ১৫ ট্যাকা, আর বকুল এক স্টিক ১০ ট্যাকা স্যার। দেই স্যার ?
ক্রেতা : গোলাপ ৫ টা দাও আর বকুল ৪ স্টিক। তোমার নাম কী ?
বালিকা : ময়না স্যার। নীলক্ষেত বস্তিতে থাকি।
ক্রেতা : কয় টাকা পাও ফুল বিক্রি করে ?
বালিকা : হের কুনো ঠিক নাই স্যার । যেমুন বিক্রি তেমুন ট্যাকা।
ক্রেতা : স্কুলে যাও না কেন ?
বালিকা : স্কুল গ্যালে খামু কী স্যার ? বাপ তো কামকাইজ করতে পারে না।
ক্রেতা : কেন কী হয়েছে তোমার বাবার ?
বালিকা : রিক্সা চালাইতে গিয়া এক্সিডেন্ট কইরা পাও ভাইঙা ফালাইছে। হেইর লাইগ্গাইতো ফুল বিক্রি করি আমি।
ক্রেতা : বড় ভাই নাই তোমার ময়না ?
বালিকা : বড় ভাইয়ে বিয়া কইরা আলেদা থাহে। আমগো দ্যাহে না।
ক্রেতা : ও তাহলে তো তোমার অনেক কষ্ট । তোমার মা কী করে ?
বালিকা : মায়ে পরের বাড়ি কাম করে। ছুট ভাই আছে একটা। তিন জনের খাওন হয় না ঐ দিয়া।
ক্রেতা : শোন ময়না, তুমি লেখাপড়া করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু আমি খুব খুশি হয়েছি যে, তুমি নিজে কাজ করে খাও। এই নাও বাড়তি ১০০ টাকা দিলাম তোমাকে। কিছু কিনে খেও।
বালিকা : আপনে অনেক ভালা স্যার।

ইংরেজি শেখার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ

নিচে আমি ও আমার বন্ধু বকুলের মধ্যে ইংরেজি শেখার গুরুত্ব নিয়ে সংলাপ দেওয়া হলো :

আমি : কেমন আছে বকুল ?
বকুল : হ্যাঁ আমি ভালো আছি। তুমি ?
আমি : ভালো। তুমি কি ইংরেজির ব্যবহার সম্পর্কে কোনো কিছু জানো ?
বকুল : হ্যাঁ। ইংরেজির গুরুত্ব সম্পর্কে আমি জানি। এটি আন্তর্জাতিক ভাষা এবং সারা পৃথিবীতে এটি ব্যবহার করা হয়। বর্তমান যুগকে ইংরেজির যুগ বলা হয়।
আমি : কেন এটি আমাদের শেখা উচিত ?
বকুল : যদি তুমি ভালো চাকরি পেতে চাও অথবা পৃথিবীর অন্য দেশ ভ্রমণ করতে চাও তোমার অবশ্যই ইংরেজি জানা দরকার। এটি একজন পর্যটক, পাইলট, প্রকৌশলী এবং যে কারও জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
আমি : আর কিছু ?
বকুল : ইংরেজি ছাড়া তুমি বর্তমান সময়ের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবে না। তোমার জ্ঞান সীমিত থাকবে এবং প্রযুক্তিনির্ভর বিদ্যা থেকে তুমি বঞ্চিত হবে।
আমি : অবশ্যই। তুমি কি ইংরেজিতে ভালো কথা বলতে পার ?

বকুল : অবশ্যই। আমি ইংরেজিতে দ্রুত কথা বলতে ও লিখতে পারি। ইংরেজিতে ভালো দক্ষতার জন্য তোমাকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে।

আমি : আমিও তাই আশা করি। আমি এখন আধুনিকতার বাইরে। সত্যি বলতে কি আমি এতোদিন ইংরেজির গুরুত্ব বুঝতেই পারিনি।

বকুল : তুমি এক্ষেত্রে আমার কাছে যেকোন সাহায্য পেতে পার।

আমি : তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ

বকুল : তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তরুণ প্রজন্মের কাছে ফেসবুকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ লিখুন।

আমি কাজল ও বন্ধু চপলের মধ্যে ফেসবুক সম্পর্কে সংলাপ নিচে দেওয়া হলো :

কাজল : সবকিছু কেমন ?

চপল : সব ভালো, ধন্যবাদ। তুমি কি ভালো ?

কাজল : আজ অনেক ভালো। এখন তুমি কি ব্যস্ত ?

চপল : না। কোন প্রশ্ন আছে কি ?

কাজল : অবশ্যই। ফেসবুক সম্পর্কে আমার কিছু তথ্য প্রয়োজন।

চপল : ওহ্ ! ফেসবুক ! এখন আমি ফেসবুকের একজন সদস্য। তুমি এটির ব্যাপারে কিছু তথ্য পেতে পার।

কাজল : যে কেউ এটিতে প্রবেশ করতে পারে কি ?

চপল : অবশ্যই। যে কেউ ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে এটি ব্যবহার করতে পারে। প্রথমে তোমার এটির সদস্য হতে হবে। তারপর তোমার সাইন আপ করতে হবে।

কাজল : কথার প্রসঙ্গে, এটি কি আমাদের জন্য প্রাজেনীয় ? কীভাবে ?

চপল : প্রয়োজন। এটি কাছে ও দূরে বসবাসকারী লোকের মধ্যে সামাজিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে। অনেকে বন্ধু হতে পারে ও অনেক তথ্য ধারণ করতে পারে।

কাজল : আর কিছু আছে ?

চপল : হ্যাঁ, তুমি খোশগল্প করার সুযোগ পাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সদস্য হয়ে যাও। অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি কর। নাহলে তুমি অনেক আনন্দ উপভোগে ব্যর্থ হবে।

কাজল : সম্পূর্ণ ঠিক বলেছ। আমি অবশ্যই তা করবো।

চপল : অনেক ধন্যবাদ। বিদায়।

কাজল : বিদায়। আবার দেখা হবে।

যৌতুক প্রথা নিয়ে দুই বান্ধবীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করুন।

যৌতুক প্রথা নিয়ে দুই বান্ধবী কানিজ ও কেয়ার মধ্যে সংলাপ রচনা করা হলো :

কানিজ : আমি কিন্তু হেলেনার বিয়েতে যাচ্ছি না।

কেয়া : আমাদের বান্ধবীর বিয়েতে আমরা সবাই একসাথে আনন্দ করতে যাবো,তুমি শুধু বাধ সাধছো কেন ?

কানিজ : হেলেনার বাবা এই বিয়েতে যৌতুক দিচ্ছেন। আর বরপক্ষও বড় অংকের যৌতুক নিয়েই হেলেনাকে বিয়ে করছে। এই কারণে আমার আপত্তি।

কেয়া : এতে আপত্তির কী আছে ? আমাদের দেশের অধিকাংশ বিয়ে তো এভাবেই হয়ে থাকে। তাছাড়া হেলেনাদের তো টাকা-পয়সার অভাব নেই।

কানিজ : বিয়েতে টাকা-পয়সা লেনদেনের পরিণতি ভালো হয় না। কেননা এতে অর্থের লোভ থাকে। এ অর্থের লোভ থেকেই স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রী হত্যার মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। এসব তো যৌতুকেরই ফল।

কেয়া : বিয়ের সময় টাকা পয়সার লেনদেন কি আইন করে বন্ধ করা যায় না ?

কানিজ : আইন তো রয়েছে। শুধু আইন দিয়েই কি যৌতুক দেয়া-নেয়া বন্ধ করা যায় ?

কেয়া : তাহলে কীভাবে যৌতুক প্রথা বন্ধ করা যায় ?

কানিজ : এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। সামাজিকভাবে এ কুপ্রথাকে বয়কট করতে হবে। মেয়েদেরকেও যৌতুকের বিনিময়ে বিয়ে নয়, এই শিক্ষা নিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। সংলাপ বলতে কী বুঝায় ? আদর্শ সংলাপের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে সংলাপ রচনা কর :

ক) বৈশাখি মেলা নিয়ে একটি সংলাপ লিখ

খ) সম্প্রতি পড়া একটি বই নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে একটি সংলাপ রচনা কর।

গ) ইংরেজিতে উন্নতি করার উপায় সম্পর্কে শিক্ষকের সঙ্গে একটি সংলাপ রচনা কর।

পাঠ-১৭ : খুদেগল্প লিখন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- খুদেগল্প কী তা বলতে পারবেন।
- খুদেগল্প রচনার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

খুদেগল্প মানে ছোট আকৃতির গল্প। সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো ছোটগল্প। কিন্তু ছোটগল্প কখনো খুদেগল্প নয়। কোন গল্প আয়তনে ছোট হলে তাকে খুদেগল্প বলা যায় কিন্তু ছোটগল্প কেবল আয়তনের উপর নির্ভর করে না। খুদেগল্প আকৃতি ও প্রকৃতিতে খুদেই হবে। খুদেগল্প লেখা শেখানোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটানো।

খুদেগল্প লেখার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে :

১। গল্পের একটা ভাব বা রূপ তৈরি করে মনে মনে তাকে সাজিয়ে নিতে হবে।
২। ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি ঘটনা শুরু করতে হবে।
৩। চরিত্রগুলো নিজেরাই নিজেদের উপস্থাপন করবে। চরিত্রের ভাষা যেন গল্পরচয়িতার ভাষা হয়ে না যায়।
৪। গল্পের ভাষা হবে সহজ সরল প্রাঞ্জল ও গতিময়।
৫। গল্পের সমাপ্তি হবে সুসংবদ্ধ।

একাত্তর

রিক্সায় বাসায় ফিরছি। ষাটের উপরে বয়স রিক্সাওয়ালা গল্প বলছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে কোয়ার্টারে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন। সারা রাস্তায় গল্প বলছিলেন তিনি। একাত্তরে তার বয়স ছিল পনেরর কাছাকাছি। মাঠে ময়দানে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। বাড়ির সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না সেই সময়। বেশ কটি অপারেশনে যোগ দিয়ে বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলেন তিনি আশেপাশের এলাকায়। কিছুদিন পর গ্রামে এসে দেখেন যুদ্ধে যাবার অপরাধে পাকসেনারা তার মা-বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছে, তাদের বাড়িটাও আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। যুদ্ধে যাবার কারণে তেমন পড়াশুনো করতে পারেননি। তাই যুদ্ধ শেষে কোন চাকরিও জোটাতে পারেননি। রিক্সা চালিয়েই জীবন কাটাচ্ছেন এখন। একাত্তরে আমার জন্ম, তাই যুদ্ধের কথা ইতিহাসে পড়েছি। কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। ঐ রিক্সাওয়ালার কথাগুলো আমার কাছে রূপকথার মতো লাগছিলো। বাসায় পৌঁছে রিক্সা থেকে নামলাম। রিক্সাভাড়া ছাড়াও তাকে বাড়তি কিছু টাকা দিতে চাইলাম, তিনি নিলেন না। বললেন– 'আমি মুক্তিযোদ্ধা, পরিশ্রম করে খেতে পছন্দ করি। কারো দয়া বা সাহায্যের আমার প্রয়োজন নেই।' অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

পথশিশু

রফিক আগেই দাওয়াত দিয়েছিলো। তার বড় ভাই এসেছে আমেরিকা থেকে। অতএব বিরাট পার্টি বন্ধুদের জন্য। শীতের রাত। তাড়াতাড়ি হাজির হয়ে গেলাম। অনেক বন্ধুবান্ধব আসতে শুরু করলো। রঙবেরঙের পোশাক তাদের। কেউ কেউ এসেছেন দামি গাড়িতে। সঙ্গে ছেলেমেয়েরা। লাফালাফি করছে কেউ, কেউ উচ্চস্বরে চিৎকার করছে। কেউবা এটা-ওটা নেবার জন্য বায়না করছে। রাত দশটার দিকে মূল আয়োজন শুরু হলো। হাসি-ঠাট্টা-গান, তীব্র স্বরে সাউণ্ড পেøয়ার বাজছে। থরে থরে খাবার সাজানো। যে যেমন ইচ্ছা খাবার নিচ্ছে, খাচ্ছে। অনেক খাবার নষ্টও হলো। অল্প খানিকটা খেয়ে অনেকে বাকি খাবার পেøটেই ফেলে রেখেছে। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিলো। কোন মতে খাওয়া শেষ করে বন্ধুর কাছ

থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এলাম। চমকে উঠলাম., এত রাতে অনেকগুলো ছোট ছোট শিশু তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু খাবার চায় তারা। এত শীতেও গায়ে তেমন কাপড় নেই ওদের। অনেকেই ক্ষুধায় কাতর বোঝা গেল।
মনটা খুব খারাপ করে বাসায় ফিরলাম। ভাছিলাম এরপরে আর কখনও এধরনের পার্টিতে যাব না। যে দেশে শীতের রাত্রিতেও পথে শিশুরা একটু খাবারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে এই রকম অনুষ্ঠান আয়োজন করাটাও অমানবিক নিষ্ঠুরতা।

প্রতিজ্ঞা

বন্যায় ঢাকা শহরের চারদিক পানিতে থৈ থৈ। শুকনো খাবার আর স্যালাইন নিয়ে আজাদ ও তার বন্ধুরা দুর্গতদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। ১৯৮৮ সালের কথা। আজাদ সেই বন্যার কথা এখনো মনে করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে আজাদ গ্রামের একটি ভালো কলেজে শিক্ষকতা করতে শুরু করলো। আবারও বন্যা। আজাদ ও তার বন্ধুরা খবর পেল রিলিফের সরকারি সাহায্য স্থানীয় হোমরা-চোমড়ারা লুটেপুটে খাচ্ছে। সেদিন রাতে এক বৈঠক করে আজাদ ও তার বন্ধুরা। ঠিক করলো এই অন্যায় ঠেকাতেই হবে এবং সাহায্য দুর্গতদের কাছে পৌঁছাতেই হবে। যেই কথা সেই কাজ। রাতে গোপনে পাহারা বসালো আজাদরা। ট্রাকে করে চাল, আটা পাচার করার মুহূর্তেই পুলিশ এসে হাজির। আজাদরা আগেই ইশারা দিয়ে রেখেছিল পুলিশ সুপারকে। পরের দিন আজাদ ও তার বন্ধুদের নেতৃত্বে সেই খাদ্যসামগ্রী গরিব লোকদের মধ্যে বিলি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে মানুষের সেবা করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল আজাদ, এবারের এই বন্যার সময় তার কিছুটা করতে পেরে খুব তৃপ্তি ও আনন্দ বোধ করলো সে।

নিঃসঙ্গতা

তাহমিনা আক্তারকে নিয়ে আশেপাশের সবার খুব কৌতূহল। এনজিওতে চাকরি করেন, একা থাকেন তাহমিনা। সবারই জিজ্ঞাসা তার ঘর-সংসার নেই ? কিন্তু কেউ হয়তো জানে না তাহমিনার অতীত ইতিহাস। কলেজে পড়ার সময় বিয়ে হয়েছিলো তাহমিনার। স্বামী হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর তাহমিনার নতুন জীবন শুরু হয়, শুরু হয় তার অন্য রকমের সংগ্রাম। ছোট ছোট দুই ভাই-বোনকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। টিউশনি থেকে শুরু করে ছোট চাকরিতে যোগ দেয় সে। ভাই-বোনরাও তাহমিনার এই কষ্টের প্রতিদান দেয়। লেখাপড়ায় মেধাবী ছিল তারা। তাদের একজন আজ ডাক্তার, অন্যজন সরকার কলেজে অধ্যাপনা করে। কিন্তু ভাই-বোনদের মানুষ করতে গিয়ে তাহমিনার আর সংসার করা হয় না। স্বামী মারা যাবার পর অনেক ভালো ভালো প্রস্তাব এসেছিলো তার বিয়ের। বাবা অকালে মারা যাওয়ায় সেই প্রস্তাবে রাজি হতে পারেনি সে। তাহলে দুই ভাই-বোনের লেখাপড়া হতো না। তাহমিনার পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া এই বয়সে এসে অনেক কথা মনে পড়ে। কেন এমন হলো জীবনটা ? নিজেকেই সে প্রশ্ন করে। সারাদিন এই মফস্বল শহরে এনজিওর কাজ শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। নিজেকে তখন অনেক নিঃসঙ্গ লাগে, একা মনে হয়।

টিউশনি

জীবনকে সেভাবে দেখা হয়নি অমিতের। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলা থেকে। টাকা-পয়সার টানাটানি। একই হলে থাকে অমিতের বন্ধু সজিব। সজিব ধনী পিতার সন্তান। সজিবই অমিতকে একটি টিউশনি জোগাড়কওে দিয়েছে। ফোনে কথা বলেছে অমিত ছেলেটির বাবার সঙ্গে। ঐ ছেলেটিকেই পড়াবে অমিত, নাম তন্ময়। তন্ময়ের বাবা অমিত বলেছে পারিশ্রমিক হিসেবে অন্যদেরচেয়ে বেশিই দিবেন তিনি। অমিত প্রথমে বুঝতে পারেনি কেন তিনি বেশি দিবেন ? প্রথম দিন তন্ময়কে পড়াতে গেলে এক অন্য অভিজ্ঞতা হয় অমিতের। পঙ্গু বিকলাঙ্গ মানুষ দেখেছে অমিত কিন্তু বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিল না তার। তন্ময়ের মা তন্ময়কে সামনে নিয়ে আসার পর অবাক হলো অমিত। চমৎকার সুদর্শন দেখতে তন্ময়। কিন্তু কোথায় যেন একটু সমস্যা আছে বলে মনে হলো অমিতের। কয়েকটি কথা বলার পরই বুঝলো তন্ময়ের বুদ্ধিটা যথেষ্ট পরিণত নয়, একটু কম বিকশিত। প্রথমে একটু বিব্রত বিরক্ত হলেও সামলে নেয় অমিত। টাকার দরকার, তাই টিউশনিটা ছাড়তে পারছে না। এভাবেই প্রথম মাসটা কাটলো। এর মধ্যে তন্ময়ের সঙ্গে একধরনের বন্ধুত্বও হয়ে গেছে অমিতের। অমিতের সবকিছু বুঝতে পারে তন্ময়, তন্ময়ের কোনকিছুই অমিতের কাছে দুর্বোধ্য নয়। মাঝে মাঝে নিজ গ্রামের গল্প করতো অমিত। তন্ময় অবাক হয়ে শুনতো সেই গল্প। একদিন অমিতের কাছে নিজের আঁকা একটি ছবি নিয়ে আসে তন্ময়। অমিত দেখলো তাদের গ্রামের অবিকল ছবি এঁকেছে তন্ময়। যেভাবে গল্প

করেছে সে, তন্ময় রঙ-তুলিতে তাই–ই তুলে এনেছে। অমিতের বুঝতে বাকি রইলো না যে, তন্ময়ের মেধা শাণিত হলেও তার প্রকাশ কিছু ধীরে। সেদিন থেকে সব দ্বিধা মুছে ফেলে সমস্ত ধৈর্য ও শক্তি দিয়ে তন্ময়কে পড়াতে লাগলো। মাস শেষে তন্ময়ের মা নির্ধারিত বেতনের চাইতেও বেশি টাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু তন্ময় জানালো বেশি বেতন লাগবে না, অন্যদের মতো দিলেই সে খুশি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। খুদেগল্প বলতে কী বুঝায় ? সার্থক খুদেগল্প রচনার বৈশিষ্ট্যসমূহ উলেøখ কর।

২। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে খুদেগল্প রচনা কর :

ক) পানি দূষণ বিষয়ে একটি খুদেগল্প রচনা কর।

খ) শিশুশ্রম নিয়ে একটি খুদেগল্প রচনা কর।

গ) গ্রাম থেকে শহরে নতুন আসা একজন লোককে নিয়ে একটি খুদেগল্প রচনা কর।

পাঠ ৮.১৮ : প্রুফ–সংশোধন নির্দেশিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রুফ কী তা বলতে পারবেন।
- প্রুফ-সংশোধন বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রুফ-সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারবেন।

লেখকের লেখার বা রচনার ছাপ দেওয়া কাগজকে সাধারণত প্রুফ বলা হয়। মুদ্রিত কোনো কিছু কারও সামনে উপস্থিত করার আগে তা প্রেসে বা কম্পিউটারে ছাপিয়ে নিতে হয়। প্রেসের কম্পোজিটর বা কম্পিউটার অপারেটর মেশিনের অক্ষরে তা আবার লেখেন। লেখার পর কাগজে ছাপ তোলেন। এ ছাপ তোলার কাগজটিই হচ্ছে প্রুফ। এই মুদ্রিত বা ছাপ দেওয়া কাগজটি হলো লেখকের লেখার একটি প্রমাণ বা প্রুফ। কম্পিউটারে বা মেশিনে লেখার সময় লেখকের লেখা হুবহু লিখেছেন কিনা তা লেখকের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। তখন যদি দেখা যায় যে, অপারেটর লেখকের লেখার থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন কিংবা বানানে ভুল করেছেন অথবা লেখকের হাতের লেখা বুঝতে না পেরে অন্য শব্দ কম্পোজ করেছেন, তখন ঐসব ত্রুটি সংশোধন করাই হলো প্রুফ-সংশোধন।
অনেক সময় লেখক নিজেও পাণ্ডুলিপিতে বানান, তথ্য ইত্যাদি ভুল করতে পারেন। কাজেই প্রুফ যিনি সংশোধন করবেন অর্থাৎ প্রুফ-রিডারকে লেখকের তথ্য, বাক্য, বানান, শব্দবিন্যাস ইত্যাদিতে ভুল থাকলে তাও সংশোধন করতে হয়।

প্রুফ-সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

১। গ্রন্থে যদি তথ্য, তত্ত্ব, বাক্য, শব্দ ও বানান ভুল থাকে তাহলে সাধারণ পাঠক ভুল শিখবে।
২। মুদ্রিত লেখা জনসাধারণে প্রকাশ পেলে এর সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় নানা বিষয় জড়িত হয়ে পড়ে। অতএব সেক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে ছাপাখানা আইন প্রযোজ্য হতে পারে। কাজেই খুব ভালোভাবে প্রুফ-সংশোধন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অপর পৃষ্ঠায় প্রুফ সংশোধনের সাংকেতিক চিহ্নগুলো সন্নিবেশিত হলো–

1.	()	জুড়ে দাও- close up
2.	⊂	(কাল দাগ) দাবাও-space appears improper
3.	X	ভাঙ্গা হরফ বদলাও-change the broken type
4.	tr.or trs	স্থানান্তরিত করা বা চাল-Transpose
5.	Cap	বড় অক্ষর-change to capital letters
6.	s. c	ছোট অক্ষর-change to small letters
7.	Ital.	বাঁকা অক্ষর বসাও-Replace with italic letters.
8.	]	ডানদিকে এগিয়ে দাও-Move to the right.
9.	[	বামদিকে এগিয়ে দাও-Move to the left
10.	]	নীচু কর-lower
11.	]	উচুঁ কর-Elevate
12.	[ ]	ছাড় দাও-Indent
13.	st. or stet	কাটা হরফ ঠিক কর-Put the lines though penned through
14.	n. p.	নতুন প্যারা আরম্ভ কর-Begin a new paragraph
15.	W. F	অন্য ধরনের হরফ হয়েছে-wrong font

16.	bold	মোটা অক্ষর দাও–Put antique letter
17.	Rom	Antique or Italic type-এর পরিবর্তে Roman type বসাও–Replace with Roman types
18.	run on	এক লাইনে সাজাও–Put into the same line
19.	=	লাইন ঠিক কর–Aline
20.	d.	তুলে দাও–Delete
21.	d. l.. or d. ld	লেড তুলে দাও–Take out the lead
22.	lead in or ld in	দুই লাইনের মধ্যে লেড দাও–Insert lead between the lines
23.	See copy	কপি ছাড় পড়েছে, দেখে ঠিক কর–Insert the word or words omitted
24.	#	ফাঁক দাও= Insert space
25.	eq #	ফাঁক সমান কর– Reduce space
26.	Less #	ফাঁক কমাও– reduce space
27.	./	ফুলস্টপ দাও–Put a full stop.
28.	;/	সেমিকোলন দাও–Put a semi- colon
29.	:/	কোলন দাও–Insert quolon
30.	?/	প্রশ্নবোধক চিহ্ন দাও–Interogative sign
31.	?	লেখকের প্রতি জিজ্ঞাসা–Query to author
32.	،	কমা বসাও–Insert comma
33.	"/	উদ্ধৃতি চিহ্ন বসাও–Insert quotation
34.	'/	উর্ধ্ব কমা বসাও–Insert apstrophe
35.	-/	হাইফেন বসাও– inset hyphen
36.	Sp.	শব্দটি আস্তে আস্তে কষ্ট সহকারে বানান করে পর–Spell out
37.	@	উল্টিয়ে বসাও–Turn the letter
38.	d⌒	তুলে দাও এবং জুড়ে দাও–Delete and close up
39.	Δ	প্রান্তীয় লেখা বসাও–Insert marginal addition
40.	(–)	ড্যাস চিহ্ন বসাও–Insert dash

আশা

আবুল হোসেন মিয়া W.F

কথা বলা সোজা অতি কাজ যে কঠিন,

কাজে তার পরিচয় মেলে প্রতিদিন।

আমাদের কাজ দেখে সবে পায় লাজ,

টালিবাজি ফাঁকিজুকি অপরূপ সাজ–

ছেলেমেয় চেনা দায়, কেনা সোজা খুব

পয়সাটি ফেলে দিলে একেবারে চুপ।

নামে চেনা দায় ফুল পায় যদি কিছু

সারমেয় সম ঘোরে তার পিছু পিছু।

নাই কোন ভেদাভেদ মান অপমান।

নামে শুধু মুসলিম কামেল– বেজান।

হও ফের হুঁশিয়ার See copy

মানুষের মত চলো, সব মুখ চেয়ে

আমরা যে আশা করি গড়িবে এ জাত

দুঃখের এই অমানিশা হবেই প্রভাত

ব্যাখ্যা

W. F	— অন্য ধরনের হরফ হয়েছে।
⊂	— ফাঁক পূরণ কর।
ँ	— ওপরে চন্দ্রবিন্দু বসাও।
#	ফাঁক দাও।
X	টাইপ বদলাও।
@	উল্টিয়ে বসাও।
See copy	ছাড় পড়েছে, কপি দেখ।
d	তুলে দাও।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি ভালো করে পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে লিখুন।

১। প্রুফ বলতে কী বোঝ ? প্রুফ সংশোধন বলতে কী বোঝায় ?

২। প্রুফ সংশোধনের প্রাজেনীয়তা বর্ণনা কর।